উপন্যাস

ফিরে আসা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com

সূচিপত্র

১. রবিবার ছাড়া প্রতিটি সকাল.....2
২. জ্ঞানব্রত কাছে এগিয়ে 3 3
৩. শশীকান্ত চুপচাপ শুয়ে রইল 5 9

১. রবিবার ছাড়া প্রতিটি সকাল

রবিবার ছাড়া প্রতিটি সকাল একেবারে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। বাড়িতে ঘড়ির সংখ্যা একুশটি, জ্ঞানব্রতর খুব ঘড়ির শখ। দেশে-বিদেশে যখনই বেড়াতে যান, বিভিন্ন আকৃতির একটি করে ঘড়ি সংগ্রহ করে আনেন। এগুলোতে চাবিও দেন তিনি নিজের হাতে।

এ ছাড়া ডাইনিং হলে আছে একটি বড়ো দেওয়াল ঘড়ি। এটা জ্ঞানব্রতর বাবার আমলের। এখনও বেশ চলে, দু-এক বছর অন্তর অন্তর অয়েলিং করতে হয় শুধু। টক টক টক টক করে সেটিতে প্রতি মুহূর্তের শব্দ হয়। জানিয়ে দেয় যে সময় চলে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজবার একটা খর-র-র খ-র-র আওয়াজ ওঠে, সেই আওয়াজ শুনলেই রান্নাঘরে কান খাড়া করে রতন। ডেকচিতে গরম জল চাপানোই থাকে, ন-টা বাজবার সঙ্গেসঙ্গে সে এসে বলবে, বাথরুমে স্নানের জল দেব?

বারোমাসই গরম জলে স্নান করা অভ্যেস জ্ঞানব্রতর।

ন-টা পর্যন্ত বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়েন, রতন এসে গরম জলের কথা বললেই স্নানের ঘরে চলে যান।

সাড়ে নটায় খাওয়ার টেবিলে। দশটায় ড্রাইভার গাড়ি বারান্দার নীচে গাড়ি বার করে তৈরি থাকে।

স্মরণকালের মধ্যে কোনোদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

সুজাতা নিজের হাতে কিছু রান্না করে না বটে, কিন্তু খাবার পরিবেশন করে নিজের হাতে। রতন সব কিছু সাজিয়ে রেখে যায় টেবিলের ওপরে!

খাবার টেবিলে এই আধঘণ্টা সময়ই যা সুজাতার জ্ঞানব্রতর সঙ্গে কথাবার্তা হয় সকালে।

জ্ঞানব্রত ওঠেন খুব ভোরে। সুজাতার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ন-টা বেজে যায়। জেগে উঠেই কোনোরকমে হুটোপাটি করে মুখ-চোখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে ছুটে আসে খাবার টেবিলে। সুজাতা না-আসা পর্যন্ত খালি প্লেট সামনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন জ্ঞানব্রত। সুজাতা এসেই বিভিন্ন পাত্রের ঢাকনা খুলে বলে, আজ, কী কী করেছে দেখি? এঁচড়ের তরকারি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি..পনির দিয়ে পালং শাক করেনি? রতন, রতন!

ছেলে পড়ে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুলে, মেয়ে উজ্জয়িনীর স্বভাবটাও অনেকটা মায়ের মতন। কলেজে যাবার ঠিক আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এজন্য মেয়েকে কোনোদিন শাসন করেননি জ্ঞানব্রত, কারণ স্কুলে প্রতিটি পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়েছে, পঞ্চম স্থান পেয়েছে স্কুল ফাইনালে। ও রাত জেগে পড়ে। উজ্জয়িনীর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে, তাই বোধ হয় ফরাসিদের মতন ওর রাত জাগার অভ্যেস।

জ্ঞানব্রতকে খাবার দিয়ে সুজাতা সেই সঙ্গে নিজে চা খায়। সুজাতার বয়েস এখন ঠিক চল্লিশ, কিন্তু শুধু সাজপোশাকের গুণেই নয়, তার শরীরটা এখনও এমন তাজা যে তার বয়েস তিরিশ বললে কেউ চট করে অবিশ্বাস করবে না। সপ্তদশী উজ্জয়িনী যে সুজাতার মেয়ে তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, ভাবে বুঝি দুই বোন।

সুজাতার চেয়ে ঠিক দশ বছরের বড়ো জ্ঞানব্রত, পুরুষ মানুষের পক্ষে এ বয়েস কিছুই নয়। শরীরটা তাঁর ভাঙতে শুরু করেছে। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুলই বেশি, চামড়ায় নেই মসৃণতা, চোখের দু-পাশে কালের পায়ের ছাপ। সার্থকতা তাঁর শরীর থেকে মূল্য আদায় করে নিয়েছে।

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল সুজাতা। জ্ঞানব্রত তিন মাস আগে সিগারেট-চুরুট পাইপ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, সুজাতা ওসব কিছু চিন্তাই করে না।

সকালের প্রথম সিগারেটটিতে পরিতৃপ্তির সঙ্গে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করল :

তুমি আজ কখন গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারবে?

জ্ঞানব্রত বলল, তোমার কখন চাই বলো?

সাড়ে এগারোটায়।

তার মানে সাড়ে বারোটা তো?

সুজাতা হাসল।

জ্ঞানব্রতর যেমন প্রতি মুহূর্তে ঘড়ির হিসেব, সুজাতা তার ঠিক উলটো। বাড়ি থেকে যদি সাড়ে এগারোটায় বেরোবে ভাবে তো, কিছুতেই সে বারোটার আগে তৈরি হতে পারে না। জীবনে একটা সিনেমাও বোধ হয় সে শুরু থেকে দেখতে পারেনি।

কোথায় যাবে?

আমাদের মহিলা সমিতির একটা মিটিং আছে।

ঠিক আছে, সাড়ে এগারোটাতেই গাড়ি আসবে।

চুমকি এই রবিবার ওর বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে যেতে চায়। তোমাকে কিছু বলেছে?

তোমাকে বলাই তো যথেষ্ট। কোথায় যাবে?

ব্যাণ্ডেল।

জায়গাটার নাম শুনতে পেলেন না জ্ঞানব্রত, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি শুনতে পেলেন গানটা।

যোধপুর পার্কে একেবারে আনোয়ার শা রোডের ওপরে মাত্র দু-বছর আগে তৈরি করেছেন এই নতুন বাড়ি। সামনে বড়ো রাস্তা, তার উলটো দিকেই একটা পার্ক, সুতরাং সামনের দিকটা কোনোদিন ব্লকড হবে না। সাত কাঠা জমি, সামনে খানিকটা বাগান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় চারখানা ঘর, নীচে চারখানা। নীচতলাটা পুরোই ভাড়া দেওয়া হয়েছে চেক কনসুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারিকে দু-টি গ্যারাজসহ।

যখন এই বাড়ি বানান জ্ঞানব্রত তখন ডান পাশের তিন কাঠার জমিটাও কিনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মালিকানা নিয়ে কী যেন গন্ডগোল ছিল। হঠাৎ এই ছ-মাস আগে সেখানে একটা তিনতলা বাড়ি উঠে গেছে। অনেক লোকজন, বেশ গোলমাল হয় ওবাড়িতে। বিভিন্ন তলায় একই সঙ্গে রেডিয়ো রেকর্ডপ্লেয়ার চলে। এইসব আওয়াজে জ্ঞানব্রত একটু বিরক্ত হন, কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই।

সেইরকমই, ওবাড়ির রেডিয়োতে একটা গান বাজছে। সে-দিকে হঠাৎ মন আটকে গেল জ্ঞানব্রতর।

...শহরে ষোলো জন বোম্বেটে;
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি
নালিশ করিব আমি, কোনখানে কার নিকটে।
পাঁচ জন ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর...হল।

গানটা শুনতে শুনতে জ্ঞানব্রতর মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ওকী, তুমি পুডিংটা খেলে না?

যতই সাহেব মানুষ হন জ্ঞানব্রত, অফিস থেকে দুপুরে তিনি কোথাও লাঞ্চ খেতে যান না। দোকানের খাবার তাঁর একেবারে পছন্দ নয়। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার তিনি। সেখানে মাঝে মাঝে যান সাঁতার কাটতে। তারপর দু-এক পেগ মদ্যপান করেন। কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করেন না।

সকাল বেলা বাড়ির রান্না তিনি খেয়ে যান তৃপ্তির সঙ্গে। আজ বিমর্ষভাবে বললেন, পুডিং? না, থাক, খেতে ইচ্ছে করছে না।

হঠাৎ তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলে?

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কোনো কথা বলছ না। শরীর ঠিক আছে তো?

শরীর? হ্যাঁ, শরীর ভালো আছে।

উঠে বাথরুমে চলে গেলেন তিনি। আয়নার দিকে চেয়ে তার মনে হল, চুল কাটা দরকার। প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার তার চুল কাটার দিন। আজ মাসের মোটে অর্ধেক। এর মধ্যে চুল বেশি বড়ো মনে হচ্ছে কেন।

জ্ঞানব্রতর বাবার ছিল মাথা ভরতি টাক। সবাই বলত জ্ঞানব্রতরও চুল থাকবে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও চুল একটুও পাতলা হয়নি।

বাবাকে অবশ্য খুব ভালো মনে নেই জ্ঞানব্রতর। তিনি যখন মারা যান তখন জ্ঞানব্রতর বয়স এগারো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে হাতের ঘড়িটা দেখলেন। দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। এখন তিনি খয়ের ছাড়া একটি পান খাবেন। তারপর গলায় টাই বাঁধবেন। সিগারেট চুরুট ছেড়ে দেবার পর এই পান খাবার অভ্যেসটা হয়েছে।

নিজের ঘরে যেতে বাঁ-পাশে মেয়ের ঘর পড়ে। দরজাটা খোলা, সারাবিছানা তছনছ করে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে উজ্জয়িনী। মায়ের চেয়েও বেশি রূপসী হয়েছে, ঠিক যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। একটুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্ঞানব্রত। দেখতে দেখতে এত বড়ো হয়ে গেল? আর কিছুদিন পরেই কোনো পরপুরুষের হাতে ওকে সঁপে দিতে হবে!

ছেলে শুভব্রতর বয়েস চোদ্দো, বছরে মাত্র তিন মাস দেখা হয় তার সঙ্গে।

সুজাতার গালে একটা অন্যমনস্ক চুমু দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরভাবে নামতে লাগলেন তিনি।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে দরজা খুলে তটস্থভাবে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার।

গাড়ি একেবারে চকমকে তকতকে না থাকলেই বিরক্ত হন জ্ঞানব্রত। আজ সেদিকে নজর দিলেন না, উঠে বসলেন।

প্রথমে যেতে হবে বেহালার কারখানায়। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগে। এই সময়টুকু তিনি ঘুমিয়ে নেন। গাড়িতে ওঠা মাত্র চোখ বুজে আসে। আজ ঘুম এল না।

নিজেই তিনি একটু বাদে অবাক হয়ে ভাবলেন, আমার মন খারাপ লাগছে কেন? কোনো কারণ নেই তো! শরীরও খারাপ নয়। তাহলে?

এর পরেই মনে এল সেই গানের কথাগুলো

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল...

তারপর?

বাকি কথা আর মনে পড়ছে না। সুরটা অবশ্য ঘুরছে মাথার মধ্যে।

এ গানের মানে কী?

জ্ঞানব্রত খুব-যে-একটা গান-বাজনার ভক্ত তা নয়। তার বাড়িতে বিলিতি রেকর্ডই বাজে বেশি। বড়োজোর দু-চারটে রবীন্দ্রসংগীত। এ গান তো মনে হচ্ছে দেহতত্ত্ব বা ওই ধরনের, এসব গান কে শুনবে? রেডিয়ো আছে, কিন্তু কক্ষনো খোলা হয় না। জ্ঞানব্রত শেষ রেডিয়ো শুনেছেন ইলেকশনের খবর শোনার জন্য। নিয়মিত রেডিয়ো শোনে মধ্যবিত্তরা।

কারখানার গেটের কাছে যখন গাড়ি এসেছে, তখন জ্ঞানব্রতর মনে পড়ল, নিল তারা সব লুটে! শহরে ষোলো জন বোম্বেটে–করিয়ে পাগল পারা নিল তারা সব লুটে...।

জ্ঞানব্রত এই গানটা যেন আগে কখনো শুনেছেন।

কবে, কোথায়?

কারখানার দেখাশুনোর ভার তাঁর ভাগনে শেখরের ওপর। জ্ঞানব্রত এ কারখানা নিয়ে মাথা ঘামান না, শিগগিরই মাদ্রাজে আর একটি কারখানা খুলবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন। তবু রোজ একবার করে এখানে আসেন। শেখর কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, জ্ঞানব্রত সেই সব রিপোর্টের ওপর এক নজরে চোখ বুলিয়ে হ্যাঁ কিংবা না বলে দেন।

একুশ বছর আট মাস বয়েস পর্যন্ত জ্ঞানব্রত ছিলেন এক অতিসাধারণ রিফিউজি ছোকরা। পড়াশুনোয় ভালোই ছিলেন, কিন্তু শৈশবে পিতৃহীন বলে মামারবাড়িতে মানুষ, টিউশনি করে নিজের খরচ চালাতে হত।

মামাদের অবস্থা ভালো ছিল না। জ্ঞানব্রতর মা ছিলেন তার ভাইদের বাড়িতে বিনি মাইনের রাঁধুনি।

টুথপেস্টের ছিপির মধ্যে যে একটা ছোট্ট গোল শোলার চাক্তি থাকে, সেই দিয়ে ব্যবসা শুরু। ওই ছোট্ট জিনিসটাও খুব জরুরি, ওটা থাকে বলেই টিউব থেকে টুথপেস্ট বেরিয়ে

আসে না। অত ছোটো জিনিস কোনো টুথপেস্ট কোম্পানি নিজে বানায় না, বাইরে থেকে কেনে।

মূলধন ছিল মাত্র দেড়শো টাকা। একটা পাঞ্চিং মেশিন আর কিছু কাঁচামাল। কারুকে না জানিয়ে জ্ঞানব্রত শুরু করেছিলেন এই কারবার, পুরোটা লোকসান গেলেও তো তার নিজের দেড়-শো টাকাই যাবে।

এখন তিনি একটি প্রখ্যাত মার্কিন টুথপেস্ট কোম্পানির সঙ্গে কোলাবোরেশনে এদেশে তৃতীয় টুথপেস্ট কারখানা খুলেছেন। মামাদের উপকারের ঋণ শোধ করে দিয়েছেন তিনি, প্রত্যেক মামাকে নিয়েছেন কোম্পানির ডিরেক্টার বোর্ডে, দু-জন মামাতো ভাইকে বিলেতে পড়িয়ে এনেছেন। শুধু তার মা-ই কোনো সুখভোগ করে যেতে পারলেন না। সবেমাত্র এই বেহালার কারখানাটা লিজ নেওয়া হয়েছে, সেই সময় মারা গেলেন মা।

অফিস ঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন জ্ঞানব্রত, হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন শেখর, তুই এই গানটা জানিস? শহরে ষোলো জন বোম্বেটে। করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।...

শেখর একেবারে অবাক।

তার মামা অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কাজের মধ্যে কোনোরকম ছ্যাবলামি করবেন তিনি, এ তো কল্পনাই করা যায় না। এ কী একটা বিদঘুঁটে গানের কথা জিজ্ঞেস করছেন!

গান? এটা কী গান?

জ্ঞানব্রত হাসলেন।

পুরোনো অভ্যেস মতোই বাঁ-হাতের দু-টি আঙুল কাঁচি করে ধরলেন মুখের সামনে, যেন সেখানে রয়েছে অদৃশ্য সিগারেট।

হঠাৎ এই গানটা শুনলাম রেডিয়োতে। তারপর অনবরত এটা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

রেডিয়োতে শুনলেন? কখন?

আজই খেতে বসে...

নতুন নামকরা শিল্পপতি এবং সদাব্যস্ত জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি সকাল বেলা খাবার টেবিলে বসে রেডিয়োতে পল্লিগীতি শুনছেন–এ দৃশ্যও শেখরের পক্ষে কল্পনা করা দুষ্কর। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা রেডিয়োর গান নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

মনে হচ্ছে যেন এই গানটা আমি আগে কোথাও শুনেছি। কোথায় শুনলাম বল তো?

আমি তো এ-রকম গান কক্ষনো শুনিনি!

তোর বাড়িতে ফোন কর তো?

বাড়িতে?

হ্যাঁ, তোর মাকে একবার ডাক।

দুই দিদি জ্ঞানব্রতর। বড়ো দিদি থাকেন ভোপালে। শেখরের মা ছোড়দি। ছেলেবেলায় খুব সুন্দর গান করতেন। তারপর যা হয় অধিকাংশ বাঙালি মেয়েদের। বিয়ের পর গান-বাজনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যায়।

ছোটদি, আমি গেনু বলছি।

বয়েসে বড়ো দিদি হলেও প্রতিমা তার এই ছোটোভাইকে একটু সমীহ করেন। জীবনে এতখানি উন্নতি করেছে সে, তার ছেলেকে বিরাট চাকরি দিয়েছে। একসময় গেনু বলে ডাকলেও এখন বলেন জ্ঞান।

কী রে কী হয়েছে?

ছোড়দি, তুমি তো একসময় অনেক গান করতে। তুমি এই গানটা জান? শহরে ষোলো জন বোম্বেটে...

না তো!

ভালো করে ভেবে দেখো, কখনো শোননি?

না। হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

এই গানটা আমার মাথায় গেঁথে গেছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। আগে শুনেছি মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত ছেলেবেলায়।

সুজাতা কেমন আছে?

ভালো আছে। তোমাকে সুরটা শোনাব? তাহলে হয়তো তোমার মনে পড়তে পারে।

অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য! আরও একজন কর্মচারী এই সময় ঘরে ঢুকেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্ক্যাণ্ডালাইজড, শেখরের সেই অবস্থা। গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট কোম্পানির একান্নভাগ শেয়ারের মালিক জ্ঞানব্রত অফিসঘরে বসে অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ে টেলিফোনে পল্লিগীতির সুর শোনাচ্ছেন দিদিকে। মাথাটা খারাপ হয়ে যায়নি তো? ঘড়ির কাঁটা ধরে এই লোকের জীবন চলে।

প্রতিমা টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই সময় তাঁর কি বলা উচিত। তাঁর ঝোঁক ছিল নজরুল ও অতুলপ্রসাদের গানে; সেও কতকাল আগের কথা। এ গান তো তিনি শোনেননি কখনো। তবু গুরুত্বপূর্ণ ছোটোভাইকে খুশি করবার জন্য তিনি আমতা আমতা করে বললেন :

হ্যাঁ, কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

এর পরের কথাগুলো জান?

না। খুশিকে অনেকদিন দেখিনি। একদিন আসতে বলিস না আমাদের এখানে।

উজ্জয়িনীর ডাকনাম খুশি! সে তার মাসিদের ভক্ত, পিসির বাড়িতে যেতে চায় না।

আচ্ছা বলব। তাহলে গানটা তুমি জান না। তোমার কাছ থেকে শুনিনি।

রাস্তার ভিখিরিরা অনেক সময় এইরকম গান গায়।

টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েই অভ্যেস মতন ঘড়ি দেখলেন জ্ঞানব্রত। ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজে। সুজাতাকে গাড়িটা পাঠাবার কথা ছিল।

এ-রকম ভুল তার কখনো হয় না।

সুজাতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিলেতে, সেই প্রথমবার জ্ঞানব্রত ওদেশে গিয়েছিলেন। এখন বছরে দু-বার-তিনবার তাঁকে বিলেত-আমেরিকায় যেতে হয়। সুজাতা তখন ওখানে পড়াশুনো করছে। আলাপের তৃতীয় দিনেই জ্ঞানব্রত বুঝেছিলেন, এই মেয়েটিকে না পেলে তাঁর চলবে না। প্রথম যৌবনেই ব্যবসা শুরু করে তার মধ্যে একবারে ডুবে গিয়েছিলেন জ্ঞানব্রত, কোনো মেয়ের দিকে তাকাবার সময় পাননি, সুজাতাকে দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে একেই, নইলে আর কারুকে নয়,

সেবার বিলেতে থাকার কথা ছিল তিন সপ্তাহ, থেকে গেলেন দু-মাস।

কেনসিংটনের একটা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে জ্ঞানব্রত দুম করে সুজাতাকে বলেছিলেন, আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তাহলে কাল আমি আসব, নইলে আজই আমাদের শেষ দেখা।

সুজাতা বলেছিল, কিন্তু আর পাঁচ মাস বাদে যে আমার পরীক্ষা!

আমি এখানেই বিয়েটা সেরে দেশে ফিরে যাব। আপনি পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে তারপর ফিরবেন।

কেন, আমি দেশে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?

না।

এত অধৈর্য কেন আপনি?

আমি চলে গেলেই আমার চেয়ে যোগ্য কেউ আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলতে পারে।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার ধারণা ছিল, যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে, তারা পরস্পরকে তুমি বলে। এ-রকম গুরুগম্ভীর ভাষায় কেউ যে কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা আমি জন্মে ভাবিনি।

আসলে জ্ঞানব্রত লাজুক। ব্যবসায়ীদের জগতে তিনি গম্ভীর মানুষ বলে পরিচিত, সেটা লাজুকতারই একটা দিক। সুজাতাকে বিয়ের দিন পর্যন্ত আপনি-র বদলে তুমি বলতে বাধো বাধো ঠেকেছে।

তক্ষুনি নিজের গাড়িটা সুজাতাকে পাঠিয়ে দিয়ে কারখানার একটা গাড়ি নিয়ে তিনি চলে এলেন স্টিফেন কোর্টে তাঁর অফিসে।

বিকেল পর্যন্ত সেই গানটা তার সঙ্গ ছাড়ল না। যতই কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করেন, সেই গানটা তাঁর মাথায় ঘুরে-ফিরে আসে। এখন তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে যে এই গানটা তিনি পুরো শুনেছেন তো নিশ্চয়ই, শুধু তাই নয়, পুরো গানটাই তিনি জানতেন। কিন্তু কার কাছে যে শুনেছেন তা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

অফিসঘরসংলগ্ন তাঁর নিজস্ব বাথরুম। বিকেলে সেখানে ঢুকে তিনি দিব্যি গুনগুনিয়ে গাইতে লাগলেন গানটা

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে

তারপর? তারপর?

জ্ঞানব্রত অনুভব করলেন এই গানটার বাকি কথাগুলো না জানতে পারলে তাঁর জীবনে আর সুখ আসবে না। রাত্তিরে ঘুমোতেও পারবেন না তিনি।

কিন্তু এ গান কী করে উদ্ধার করা যাবে? সকাল বেলা কোনো এক অখ্যাত গায়ক রেডিয়োতে গেয়েছে এই গান। কে তা শুনেছে বা মনে রেখেছে? অন্তত জ্ঞানব্রত যে-জগতে ঘোরাফেরা করেন সেখানে কেউ শুনবে না এই গান।

ফোন তুলে জ্ঞানব্রত চাইলেন আর. সি. চৌধুরি অ্যাণ্ড কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাম্বার।

রশিদ সাহেব? আমি জ্ঞানব্রত চৌধুরি বলছি। টোকিও থেকে কবে ফিরলেন?

এই তো পরশু। আপনার জন্য একটা ঘড়ি এনেছি। আমার গরিবখানায় কবে আসবেন বলুন? নেক্সট সানডে?

না, ওই রবিবার আমি থাকব না, পরে হবে একদিন। আপনাকে অন্য একটা দরকারে ফোন করছি। আপনার বাড়ির পার্টিতে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, কলকাতা রেডিয়ো স্টেশনের নতুন স্টেশন ডিরেক্টর, কী যেন নাম ভদ্রলোকের?

এই রে, নাম তো জানি না আমিও। কেন, খুব দরকার?

আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন, আপনি তার নাম জানেন না?

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ ওনার ওয়াইফের খুব বন্ধু। এক সঙ্গে পড়তেন কলেজে! সেইজন্য আপনার ভাবিই নেমন্তন্ন করেছিলেন ওদের দুজনকে। নামটা বলেছিলেন বটে, এখন ভুলে গেছি।

আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে নামটা জানা যায় না?

কেন যাবে না? হঠাৎ রেডিয়োর স্টেশন ডিরেক্টরকে আপনার কী দরকার পড়ল? পাবলিসিটি দেবেন?

না, না, সেসব কিছু নয়, অন্য একটা দরকার!

দশ মিনিট বাদে রশিদ সাহেব জানিয়ে দিলেন যে রেডিয়ো স্টেশনের ওই পরিচালকটির নাম পি সি বড়ুয়া।

এবার জ্ঞানব্রত চাইলেন রেডিয়ো স্টেশন।

আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রশিদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে, মনে করতে পারছেন তো?

নিশ্চয়ই। গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট তো? আমেরিকাতে আমি যখন পড়াশুনো করতুম, তখন থেকেই ওই টুথপেস্ট ব্যবহার করি।

আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার ছিল।

বলুন।

ঠিক মুহূর্তে সামলে গেলেন জ্ঞানব্রত। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! তার পক্ষে রেডিয়োর স্টেশন ডিরেক্টরকে টেলিফোন করে হঠাৎ একটা পল্লিগীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা একেবারেই চলে না। মাস্ট নট ডান।

আপনি আজ সন্ধ্যে বেলা কি ব্যস্ত আছেন? ক্যালকাটা ক্লাবে একবার আসতে পারবেন?

ক-টার সময়?

এই ধরুন সাড়ে-আটটা?

আচ্ছা আসব। এই ধরুন এইটস! আপনি কোথায়...

আমি ওপরের বার রুমে থাকব।

ঠিক আছে দেখা হবে। আমার স্ত্রী সেদিন বলছিলেন, আপনার স্ত্রীর হাসিটি একেবারে গোল্ডেন স্টার স্মাইল। হাঃ হাঃ হাঃ।

জ্ঞানব্রত চিন্তা করে দেখলেন আজ সারাদিনে তিনি প্রায় কিছুই কাজ করেননি। কী একটা সামান্য গান তাঁকে একেবারে পাগলা করে তুলেছে। আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে পুরো ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

ওই বোম্বেটে শব্দটা! জ্ঞানব্রতর যেন মনে হচ্ছে এই গানেই তিনি বোম্বেটে শব্দটা প্রথম শোনেন। শহরে ষোলোজন বোম্বেটে ...এ লাইনটার নিশ্চয়ই অন্য কোনো মানে আছে। পুরো গানটা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

সুজাতাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন, আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে।

রেডিয়োর স্টেশন ডিরেক্টর ক্যালকাটা ক্লাবে আসবেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাঝখানে অনেকটা সময়। জ্ঞানব্রত সাধারণত দুটোর পর অফিসে থাকেন না। এক একজন লোক দিন-রাতের বেশিরভাগ সময়ই অফিসে কাটাতে ভালোবাসে। খুব বেশি কাজের চাপ থাকলে জ্ঞানব্রত ফাইলপত্র বাড়িতে নিয়ে যান কিংবা ম্যানেজারদের বাড়িতে ডাকেন। তার বাড়িতে এজন্য দু-খানা আলাদা ঘর আছে।

সন্ধ্যের সময় অফিসের বদলে বাড়িতে বসে কাজ করার একটাই কারণ, খুব বেশিক্ষণ সুট-টাই-মোজা-জুতো পায়ে থাকা পছন্দ করেন না তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব ধড়াচুড়ো ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি আর চটি পরলেই স্বস্তি।

আজ আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হবে না। এখন বাড়ি ফিরে আবার ক্যালকাটা ক্লাবে আসা একটা ঝক্কির ব্যাপার। জ্ঞানব্রত এখন বেশ লজ্জা পাচ্ছেন। কেন পি. সি. বড়ুয়াকে ডাকতে গেলেন। কী বলবেন তিনি ওঁকে? হঠাৎ এ-রকম ছেলেমানুষি কেন-বা চাপল কে জানে।

চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন জ্ঞানব্রত। সাত-তলায় ওপরের এই ঘর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ওইতো কাছেই রেডিয়ো স্টেশন। তিনি ইচ্ছে করলেই ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারতেন বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে। কিংবা ওঁকে বলতে পারতেন, অফিস থেকে ফেরার পথে টুক করে দু-মিনিট থেমে যাবেন এখানে। কিন্তু সেটা রীতি নয়। অল্প পরিচিত হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের ক্লাবে ডাকাই নিয়ম।

ডালহাউসি স্কোয়ারের চারপাশ এখন লোকে লোকারণ্য। ওপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বুঝি কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে গেছে। সেসব কিছুই নয়, অফিস ছুটির সময় এ-রকম ভিড়ই হয়।

অন্য দিনের মতো ঠিক ছ-টার সময় বেরোলেন জ্ঞানব্রত।

সুজাতা বিকেলের দিকে আবার গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। না দিলেও অসুবিধে ছিল না। অফিসের অন্য যেকোনো একটা গাড়ি নিতে পারতেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়াল। ভেতরে উঠে বসে তিনি বললেন, ইডেন গার্ডেনের দিকে চলো।

শিক্ষিত ড্রাইভার কখনো বিস্ময় প্রকাশ করে না।

সন্ধ্যের সময় বড়োবাবু ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যাবেন, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু সে কোনো কথা না বলে সে-দিকেই গাড়ি ঘোরাল।

এক্ষুনি ক্যালকাটা ক্লাবে যেতে চান-না জ্ঞানব্রত। সেখানে চেনাশুনো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। এইসময়ে যারা যায়, তারা মদ খেতেই যায়। তাদের পাল্লায় পড়লে তাঁকেও মদের গ্লাস নিয়ে বসতে হবে। কিন্তু তাঁর মদ খাওয়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক নেই, মাঝে মাঝে দু-তিন পেগ খান বটে। খুব-একটা উপভোগ করেন না।

পি. সি. বড়ুয়াকে তিনি বার রুমে আসতে বললেন কেন? খেতে বসলে তো ড্রিংক না নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিছু না ভেবেই তখন বলেছেন। এখন বুঝলেন একটা কারণও আছে। রশিদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে তিনি পি সি বড়ুয়াকে ঘন ঘন স্কচ নিতে দেখেছিলেন।

ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম গেটটার সামনে গাড়িটা থেমে গেল। জ্ঞানব্রতকে অন্যমনস্ক দেখে ড্রাইভার শুধু বলল, স্যার।

সময় কাটাবার জন্য ইডেন গার্ডেনে তিনি ঘুরে বেড়াবেন? সেটা হাস্যকর। ওখানে অল্প বয়েসি ছেলে-মেয়েরা যায়। অন্তত পঁচিশ বছরের মধ্যে জ্ঞানব্রত ইডেন গার্ডেনের এই দিকটায় সন্ধ্যে বেলা একবারও আসেননি। ক্রিকেটের সময় দুপুরে আসতেন বটে, তাও সারাদিনের পুরো খেলা কোনোবারই দেখা হয়নি।

তার চেয়ে গঙ্গার ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে হয়। শীতের বেলা, এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জ্ঞানব্রতর মনে পড়ল অনেকদিন তিনি কোনো নদী দেখেননি।

ড্রাইভারকে বললেন, তুমি এখানে থাকো। আমি আসছি।

স্ট্যাণ্ডের কাছটায় যে এমন সুন্দর সব ফুলের গন্ধ আর এ-রকম বাঁধানো রাস্তা হয়েছে জ্ঞানব্রত জানতেনই না। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এমনকী তার বয়সি লোকও রয়েছে।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে জ্ঞানব্রত আপন মনে গুনগুন করে সেই গানটা গাইতে লাগলেন

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা
সব লুটে

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন, আমার কি মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল? এ কী গান আমি গাইছি? এ-গানটা সারাদিন আমার মাথায় গেঁথে আছে কেন? এর মধ্যে কী জাদু আছে। ট্রেনের ভিখিরি কিংবা বাউল-টাউলরা এ-রকম গান গায়, এর সঙ্গে গোল্ডেন স্টার টুথ পেস্ট কোম্পানির মালিকের কী সম্পর্ক!

একটু বিরক্ত মুখে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন।

বড়ো বড়ো কয়েকটা জাহাজ আলোকমালায় সাজানো। ছোটো ছোটো অনেকগুলো নৌকা মোচার খোলার মতন দুলছে, এই মাত্র স্টিমার জলে ঢেউ তুলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে ডেকে চলে গেল। এই গানটার সঙ্গে জ্ঞানব্রতর ছেলেবেলার কোনো যোগ আছে নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রতর খুব ভালো মনে পড়ে না ছেলেবেলার কথা। এগারো বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। তারপর থেকে সব স্মৃতিই খুব স্পষ্ট, কিন্তু বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন তার আগের দিনগুলো যেন হারিয়ে গেছে একেবারে। অথচ সেইসবই ছিল সুখের দিন। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে তাদের সংসারটা লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় জ্ঞানব্রতর গাড়ি থামল ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে।

এখনও তাঁর অন্যমনস্ক ভাবটা যায়নি। কোনো দিকে না তাকিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ প্রায় মুখোমুখি একজন দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বলল, হ্যাল্লো জি বি! সিয়িং ইউ আফটার আ লং টাইম! একা যে?

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে একটি বেশ দীর্ঘকায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে দেখলেন। তার পাশে এক ছিপছিপে চেহারার তরুণী মেয়ে।

পুরুষটিকে চেনেন জ্ঞানব্রত, কনসালটেন্সি ফার্ম আছে। জ্ঞানব্রত ব্যবসা শুরু করার পর গোড়ার দিকে কিছুদিন এর সাহায্য নিয়েছিলেন, এখন বিশেষ যোগাযোগ নেই, তবে তিনি শুনতে পান বাজারে এর অনেক টাকা ধার।

জ্ঞানব্রত ফিকে হাসির সঙ্গে বললেন, কী খবর, পি সি?

খবর তো অনেক। আমরা চলে যাচ্ছিলুম...চলুন তাহলে আপনার সঙ্গে আর একটু বসি। জি বি আপনি খানিকটা রিডিউস করছেন মনে হচ্ছে। ইউ লুক ইয়াং।

উঁচু মহলে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। নামের ইংরেজি দু-টি আদ্যক্ষর বলাই রেওয়াজ। জি পি, পি সি, আর এন, পি কে যেন মানুষ নয়, কোনো গুপ্ত সাংকেতিক চিহ্ন।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, পি সি নামের লোকটি এরই মধ্যে বেশ খানিকটা নেশা করেছে। ওর সঙ্গে টেবিলে বসে কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই তার। কিন্তু লোকটি নিজেই নিজেকে নেমন্তন্ন করছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, আমার সঙ্গে একজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অকারণেই হা-হা করে হেসে উঠে পি সি বলল কোনো গোপন ব্যাপার? কোনো পরস্ত্রী? আমরা সেখানে থাকলে অপরাধ হবে?

তারপর হঠাৎ মনে-পড়া ভঙ্গিতে পি সি তার পাশের মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আলাপ করিয়ে দিই, মিট মাই কাজিন এলা। এই মেয়েটির নাম এলা..ইয়ে-মানে -কী যেন পদবি তোমার, কিছুতেই মনে থাকে না।

মেয়েটি বলল, মুখার্জি। এলা মুখার্জি।

পি সি নামের লোকটি তার এমনই কাজিনকে সঙ্গে এনেছে, যার পদবিও সে জানে না। আজকাল এ-রকম কাজে মিথ্যে কথা বলার দরকার হয় না। ওই পি সি যেকোনো মেয়ের সঙ্গেই ক্যালকাটা ক্লাবে এসে থাক না কেন তাতে জ্ঞানব্রতর কী আসে-যায়?

তলা থেকে আরও লোক আসছে, এই সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। জ্ঞানব্রত ওপরে উঠতে শুরু করতেই পি সি আর এলা মুখার্জি এল সঙ্গে সঙ্গে।

কোণের একটা টেবিলে বসবার পর পি সি জ্ঞানব্রতকে বলল, আই উইল হ্যাভ ওয়ান স্কচ অন ইউ। এলা কী খাবে আপনি জিজ্ঞেস করুন। ইউ ক্যান অফার হার হোয়াটএভার ইউ লাইক।

এলা বলল, সে আগে জিন আর লাইম খেয়েছে, এখনও তা-ই খাবে।

বয়কে ডেকে মৃদুকণ্ঠে হুইস্কি, জিন এবং নিজের জন্য মিনারাল ওয়াটার অর্ডার দিলেন জ্ঞানব্রত।

এলার কাঁধে আলগা হাত রেখে পি সি বলল জান তো এলা; এই জি বি নাও আ ভেরি বিগ ম্যান-কিন্তু একসময় ছিল, আমার কাছে আসতে হত, আমি ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দিয়েছি। জি বি, দিইনি? ঠিক বলছি?

পি সি-র উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। একসময় সে জ্ঞানব্রতর উপকার করেছে। এখন তার প্রতিদান চায়। দু-চার পেগ স্কচ খাওয়াবে এ আর এমন কী! কিন্তু এ-রকম প্রতিদান যে সে অনেকবার নিয়েছে তা এলা জানে না।

জ্ঞানব্রত কৃপণ নন, পি সি-কে খাওয়াতে তার আপত্তি নেই। তা ছাড়া এইসব খরচই যাবে তাঁর এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে। কিন্তু তিনি জানেন, একবার নেশা হয়ে গেলে, পি সি আর থামতেই চাইবে না।

এলা মেয়েটি খুবই সুশ্রী। মুখে বুদ্ধির আভা আছে। পি সি-র সঙ্গে তার বয়েসের অনেক তফাত, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই। এইসব মেয়েকে মদ্যপানের সঙ্গিনী হিসেবে পি সি জোগাড় করে কীভাবে? আর এইসব মেয়েরাই-বা আসে কেন?

এলা নিজের হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করল। দু-টিই বেশ দামি। তারপর জ্ঞানব্রতর দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে জিজ্ঞেস করল, আমি আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি?

জ্ঞানব্রত অবাক না হয়ে পারলেন না। তাঁর সামনে মদ খেতে পারে, অথচ সিগারেট ধরাতে লজ্জা, এ আবার কী ধরনের মেয়ে?

জ্ঞানব্রত কিছু বলবার আগেই পি সি বলে উঠল, আরে খাও, খাও! জি বি কিছু মনে করবে না। বছরে দু-তিনবার লণ্ডন-আমেরিকা যায়। এলা বলল, না আমি ওকে আগে থেকেই চিনি কিনা!

আপনি আমাকে চেনেন?

আমাকে আপনি বলছেন কেন? পি সি আবার মাঝখানে বলে উঠল ওকে আপনি বলার কী আছে? জি বি ইউ আর সো ফরমাল...

জ্ঞানব্রতর মনে হল, এখানে এখন পি সি না থাকলেই ভালো হত। এলা নামের এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ভালো লাগত। এক-একটি মেয়ে থাকে, যাদের মুখের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, এলা সেইরকম।

তুমি আমায় আগে থেকে চেনো?

হ্যাঁ, একবার দেখেছি। আপনি তো উজ্জয়িনীর বাবা! উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমি ব্রেবোর্নে পড়েছি এক বছর। তখন একবার আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

জ্ঞানব্রত স্পষ্ট টের পেলেন, তাঁর শরীরটায় ঝনঝন শব্দ হল। এই মেয়েটি তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীর সহপাঠিনী? পি সি-র মতন একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে ঘোরে। তাঁর সামনে বসে মদ খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে তাঁর মেয়ের বান্ধবী, উজ্জয়িনীর কত বয়েস? কয়েক মাস আগেই ওর কুড়ি বছরের জন্মদিন গেল না? এই মেয়েটির বয়েসও তা হলে কুড়ি-একুশ। তবে কি উজ্জয়িনীও অন্য কোথাও অন্য কারুর সঙ্গে এইভাবে...না না, তা হতেই পারে না?

দু-এক মুহূর্ত আগে জ্ঞানব্রত ছিলেন পুরুষ মানুষ, এখন হয়ে গেলেন বাবা। তাঁর মেয়ের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হতে লাগল, উজ্জয়িনী অনেক স্বাধীন হয়ে গেছে, যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়... জ্ঞানব্রত তেমন খবর রাখতে পারেন না।

এলা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, উজ্জয়িনী এখন এম. এ. পড়বে না? আমি আর এম. এ. টা পড়লুম না!

তৎক্ষণাৎ সস্তা রসিকতার সুরে পি সি বলল, তার বদলে প্রেমে পড়ে গেলে! হাঃ-হাঃ হাঃ!

জ্ঞানব্রত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। এলার দিকে তিনি আর তাকাতেও পারছেন না।

এলা বলল, কলেজে আমরা একবার তাসের দেশ করেছিলুম, উজ্জীয়িনী হরতনি সেজেছিল, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন?

জ্ঞানব্রত দু-দিকে মাথা নাড়লেন।

আমি হরতনির গান গেয়েছিলুম পেছন থেকে।

পি সি বলল, খুব ভালো গান গায়। জি বি-র অবশ্য গান-টান শোনার সময় নেই, সেকিং মানি অল দা টাইম

গান কথাটা শোনামাত্র জ্ঞানব্রতর আবার মনে পড়ল সেই লাইনগুলো–শহরে ষোলো জন বোম্বেটে–করিয়ে পাগলপারানিল তারা সব লুটে।

পি সি বলল, বাংলা সিনেমায়, রেডিয়োতে আজকাল যা বাজে বাজে গান হয়, সেই তুলনায় এলা...শি ইজ আ ওয়াণ্ডার...এমন চমৎকার গলা!

চুপ করো! তুমি বড়ো বাড়িয়ে বলছ।

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে তাকালেন। এলা তুমি বলে কথা বলে পি সি-র সঙ্গে। এই মেয়েটির পশ্চাৎপটটা তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসও তাঁর নেই।

পি সি-র গেলাস খালি হয়ে গেছে। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই সে বলল, হ্যাঁ দাও, আর একটা!

এলা আর নিতে চাইল না। সে বলল, আমি এবার উঠব। তা ছাড়া উনি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন, আমরা শুধু শুধু ডিসটার্ব করছি ওঁকে–

এক্ষেত্রে ভদ্রতা করে জ্ঞানব্রতর বলা উচিত, না, না, সেরকম কোনো ব্যাপার নয় ইত্যাদি। কিন্তু সে-সুযোগও তিনি পেলেন না, তার আগেই পি সি বলে উঠল, আরে যাঃ। জি বি-কে কি আমি আজ থেকে চিনি? কতকালের সম্পর্ক! সার্টেইনলি হি ওন্ট মাইণ্ড...তোমার মতো একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখেও বিরক্ত হবে, কী, জি বি?

জ্ঞানব্রত বললেন, মাই প্লেজার!

পরের গেলাসে দু-চুমুক দিয়েই পি সি বলল, আমি একটু আসছি। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

এবার জ্ঞানব্রত আর এলা মুখোমুখি। জ্ঞানব্রত অশ্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না।

জ্ঞানব্রত একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কী?

আপনার মাথায় এত চুল, একটাও পাকেনি।

ও, বয়েস।

এখনও খুব ইয়াং আছেন!

এলার হাসিটা দেখে আরও চমকে উঠলেন জ্ঞানব্রত। কম বয়সি মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশার অভ্যেস না থাকলেও এ হাসি দেখলে চিনতে ভুল হয় না। প্রশ্রয়ের হাসি। পি সি-র অনুপস্থিতিতে এলা তাকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে। তার মেয়ের সমবয়সি একটি মেয়ে...

জি ই সি কোম্পানির চৌধুরি এই সময় বাথরুমে ঢুকে জ্ঞানব্রতকে দেখে কথা বলার জন্য এগিয়ে এসে থমকে গেলেন হঠাৎ। তারপর দ্রুত চলে গেলেন উনি। এ-রকম ভরসন্ধ্যে বেলা ক্যালকাটা ক্লাবে কোনো যুবতী মেয়েকে নিয়ে মদের টেবিলে বসে থাকবেন জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি, এ-রকম যেন কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

জ্ঞানব্রত মনে মনে একটু হাসলেন। চৌধুরি, বোধ হয় ভাবলেন হঠাৎ রাতারাতি তার চরিত্র পালটে গেছে।

কী মুশকিল, পি সি আসছে না কেন? বাথরুম করতে এত দেরি হয়? নিশ্চয়ই আর কারুর সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে।

কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়, তাই জ্ঞানব্রত কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাক?

গোল পার্কে। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে।

হোস্টেলে? তুমি চাকরি করো?

করতাম। এখন করি না।

পর মুহূর্তেই এলা ঝরঝর করে হেসে বলল, ভয় নেই, আপনার কাছে চাকরি চাইব না। আমার গান-বাজনা নিয়ে থাকার ইচ্ছে। আপনি গান ভালোবাসেন না?

খুব যে ভালোবাসি কিংবা বুঝি, তা বলতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে শুনি।

সামনের সপ্তাহ থেকে যে হাফেজ আলির নামে কনফারেন্স হচ্ছে তাতে যাবেন? আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

একটু গম্ভীর হয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সামনের সপ্তাহে আমার কলকাতায় থাকা হবে না। মুম্বাই যেতেই হবে।

বাবা! আপনারা সবসময় এত ব্যস্ত।

তুমি কী গান করো? পল্লিগীতি কিংবা পুরোনো বাংলা গান জানো?

ফোক সঙ? না ওসব আমি করি না..আমি নজরুল অতুলপ্রসাদের গান...রবীন্দ্রসংগীতও শিখেছি। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের আর্টিস্ট এত, যে চান্স পাওয়া যায় না।

এবার রেডিয়ো স্টেশনের বড়ুয়া দরজা দিয়ে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। জ্ঞানব্রত হাত তুললেন।

বড়ুয়া এলার দিকেই তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বড়ুয়া ও জ্ঞানব্রত প্রায় সমবয়সিই মনে হয়, মাথার চুলে কিছু পাক ধরেছে। কিন্তু জ্ঞানব্রতর তুলনায় বড়ুয়া অনেকটা ছটফটে ধরনের মানুষ। এদের আদিবাড়ি চট্টগ্রামে, তবে এখন নিজেকে অসমিয়া বলে পরিচয় দেন।

পাক্কা সাহেবের মতন সুট-টাই পরা বড়ুয়ায়। বসেই কোটের দু-পকেট থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, আই অ্যাম স্লাইটলি লেট–আটটা দশ–এই যাঃ! সিগারেট আনতে ভুলে গেলাম!

টেবিলের ওপর এলার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পড়ে আছে। বড়ুয়া ধরেই নিলেন সেগুলো জ্ঞানব্রতর। তিনি সে-দিকে অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়াতেই জ্ঞানব্রত বললেন, আমি সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি, আপনার কী ব্র্যাণ্ড?

এলা বলল, নিন না!

এবার আলাপ করিয়ে দিতে হয়। জ্ঞানব্রত বললেন ইনি মিস এলা মুখার্জি, গান করেন, আর ইনি এন সি বড়ুয়া কলকাতা রেডিয়োর...

বড়ুয়ার চোখে বেশ খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠল। তিনি একবার এলার মুখের দিকে, একবার জ্ঞানব্রতর দিকে তাকাতে লাগলেন। ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না।

এ-রকম অদ্ভুত অবস্থায় জ্ঞানব্রত কখনো পড়েননি। ঝোঁকের মাথায় বড়ুয়াকে তিনি এখানে ডেকেছিলেন। বড়ুয়া নিশ্চয়ই একটা-কিছু কারণ জানতে চাইবেন। অন্তত মনে মনে। কিন্তু কী কারণ দেখাবেন জ্ঞানব্রত? যা বলতে চান তাও এখন বলা যাবে না। এলাকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। এলা গান গায়। বড়ুয়া হয়তো ভাববেন এই মেয়েটির

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যই তাঁকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মেয়েটিকে যে জ্ঞানব্রত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও চিনতেন না। তা কি বিশ্বাস করবেন?

এরপরই এসে পড়ল পি সি।

জ্ঞানব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলা হবে না, কোনো কথাই বলা হবে না আজ। অনাবশ্যক অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছেন।

তার ইচ্ছে হল, কারুকে কিছু না বলে হঠাৎ এখান থেকে উঠে চলে যেতে।

সে-রাতে জ্ঞানব্রত বাড়ি ফিরলেন এগারোটার পর এবং বেশ মাতাল অবস্থায়। এটা একটা অভিনব ঘটনা।

সুজাতা অবাক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিলিতি শিক্ষা অনুযায়ী মুখে সে-ভাব ফোটাল না। কোনো এক ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকের লেখায় সুজাতা পড়েছিল যে, যারা প্রকৃত লেডি, তারা কোনো কিছুতেই চট করে অবাক হয় না।

কেন দেরি হল, কাদের সঙ্গে ছিল এসব কিছুই জিজ্ঞেস করল না সুজাতা। শুধু জানতে চাইল, তুমি কি রাত্রে আর কিছু খাবে?

জ্ঞানব্রতর চক্ষু দু-টি লাল, চুল এলোমেলো, টাইয়ের গিট আলগা। সারামুখে একটা জ্বলজ্বলে ভাব। মাথা নেড়ে বললেন না।

স্বামী-স্ত্রীর একই শয়নকক্ষ বটে কিন্তু আলাদা দু-টি খাট। ঘরটি বেশ বড়ো। খাট দু-টি দু দিকের দেয়ালে পাতা। এই ব্যবস্থা এইজন্য যে সুজাতা অনেক রাত জেগে উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। জ্ঞানব্রত ঘুমিয়ে পড়েন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় এবং চোখে আলো তাঁর সহ্য হয় না। সুজাতার খাটের সঙ্গে একটা ছোট্ট আলো লাগানো আছে বই পড়বার জন্য।

সুজাতা বলল, তুমি অ্যাসপিরিন বা অ্যান্টাসিড-জাতীয় কিছু ওষুধ খাবে?

জ্ঞানব্রত প্রথমে দু-দিকে ঘাড় নাড়লেন। তারপর এক মুখ হেসে শিশুর মতন আবদারের গলায় বললেন, একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। দেবে?

এতেও বিস্মিত ভাব দেখালেন না সুজাতা।

আজ এ-রকম পরপর নিয়মের ব্যাতিক্রম করছেন জ্ঞানব্রত।

একসময় তাঁর মুখে সিগারেট কিংবা চুরুট সবসময় লেগে থাকত। সাত মাস আগে একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার অবশ্য অনেক পরীক্ষা করেও হার্টের কোনো রোগ ধরতে পারেননি। তবে সাবধান হওয়া ভালো। সিগারেট চুরুট এসব ছাড়া দরকার।

সিগারেটের অভ্যেস ছাড়া পৃথিবীর বহু লোকের পক্ষে খুব শক্ত হলেও জ্ঞানব্রতর কাছে কিছুই না। সেই যে চুরুটের বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায় তারপর থেকে এই সাত মাসের মধ্যে একবার ভুলেও ধূমপানের ইচ্ছে প্রকাশ করেননি। তাঁর যেমন কথা, তেমন কাজ।

একসময় মুখে দুটো সিগারেট একসঙ্গে নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে জ্ঞানব্রত তার একটা দিতেন সুজাতাকে। বিয়ের পর কিছুদিন রাত জেগে গল্প করার সময় দু-জনে পাশাপাশি বসে এক প্যাকেট সিগারেট উড়িয়ে দিতেন।

সুজাতা সিগারেটের অভ্যেস ছাড়তে পারেনি।

স্বামীর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আই থিংক, ইউ বেটার নট।

খাই-না একটা!

আগেকার মতন আর এক সঙ্গে দুটো সিগারেট জ্বালালেন না জ্ঞানব্রত। শুধু নিজেরটা ধরিয়ে বললেন, আজ একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে। একটা গানের ক-টা লাইন এমন মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। এমনকী এতখানি মদ গিলে ফেললুম, তাও যাচ্ছে না!

কী গান?

একটা হেঁচকি উঠতেই প্রথমে মুখে হাতচাপা দিয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সরি। তারপর উ উ করে সুর ভেঁজে গেয়ে উঠলেন–

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি...

এমনিতেই জ্ঞানব্রতর গলায় খুব একটা সুর নেই, মাতাল অবস্থায় তার গলাটা আরও মজার শোনাচ্ছে।

সুজাতা হেসে ফেলে বলল, বাঃ বেশ গানটা তো!

পরের লাইনগুলো মনে পড়ছে না।

এটা কার গান?

কী জানি! আমি কি গান-বাজনার কোনো খবর রাখি? তবু এই একটা অদ্ভুত গান যে কেন মাথায় ঢুকে গেল...

এবার শুয়ে পড়ো, ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জ্ঞানব্রত ধড়াচুড়ো ছেড়ে রাত্রের শোবার পোশাক পরতে লাগলেন। যথেষ্টই নেশা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর পা কেঁপে যাচ্ছে।

আচ্ছা সুজাতা তুমি এই গানটা আগে কখনো শুনেছ।

না!

অথচ আমার মন বলে আমি আগে এটা অনেকবার শুনেছি। তা কী করে সম্ভব?

সুজাতার খাটের ওপর একটা বই অর্ধেক উলটানো। বেলজিয়ান লেখক জজ নিমেনোর সে নিদারুণ ভক্ত। গোয়েন্দা উপন্যাসের অর্ধেকটা যার পড়া হয়েছে, তার কেন সেই সময় একটা আজেবাজে গান সম্পর্কে আলোচনা শুনতে ভালো লাগবে?

-তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আসছি। সুজাতা চলে গেল বাথরুমে। টুথপেস্ট কোম্পানি মালিকের স্ত্রী বলেই নয়, রাত্রে শোবার আগে দাঁত ব্রাশ করা সুজাতার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। টুথপেস্ট কোম্পানির মালিক স্বয়ং অবশ্য রাত্রে দাঁত মাজেন না শুধু তাই নয়, দাঁত মাজার পর টুথপেস্টের গন্ধমাখা মুখে চুমু খেতেও তাঁর ভালো লাগে না। সুজাতা তার স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আজ আর তাঁর চুমু খাওয়ার কোনো বাসনা নেই।

সুজাতা ফিরে এসে দেখল জ্ঞানব্রত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন জানলার কাছে।

প্রায় বারোটা বাজল, তুমি ঘুমোবে না?

হ্যাঁ, এবার শুচ্ছি। অনেক দিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। চলো এবার কোনো গ্রামে বেড়াতে যাই। যাবে?

তুমি যে বলেছিলে সামনের দু-তিন মাসে তোমার খুব বেশি কাজ? হায়দরাবাদে একটা ফ্যাক্টরি খোলা হবে...

হ্যাঁ, কাজ আছে তো বটেই...কিন্তু মন টানছে এমন কোথাও যাই, যেখানে সবুজ গাছপালা, একটা বেশ নির্জন নদী।

সুজাতার কাছে গ্রাম মানে ট্রেনের দু-ধারের দৃশ্য। শান্তিনিকেতনের চেয়ে কোনো ছোটো জায়গায় সে জীবনে থাকেনি। সাদা টালি বসানো বাথরুম যেখানে নেই সেসব জায়গা সুজাতার পক্ষে বাসযোগ্যই নয়। সুজাতার রূপ এবং সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই এই ভাবটা রয়েছে যে, এই পৃথিবীতে সে অবিমিশ্র সুখভোগের জন্যই এসেছে।

কেনই-বা সুখভোগ করবে না। একটাই তো জীবন?

তুমি যদি সময় করতে পার, চলো তা হলে একবার শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে আসি। চুমকিও বলছিল..

আগের বার শান্তিনিকেতন গিয়ে তোমার ভালো লাগেনি।

যা গরম ছিল সেবার। টুরিস্ট লজের যে ঘরটা আমাদের দিয়েছিল, এয়ারকুলারটা কোনো কাজ করছিল না।

হা-হা-হা-হা।

২. জ্ঞানব্রত কাছে এগিয়ে

জ্ঞানব্রত কাছে এগিয়ে এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরলেন। সুজাতা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতেই তিনি বললেন, না, না, ভয় নেই, চুমু খাব না, তুমি কী সুন্দর, সুজাতা! তুমি স্বর্গের মানুষ। এই পৃথিবীর নও; গুড নাইট!

নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেও তক্ষুনি ঘুম এল না জ্ঞানব্রতর। ক্যালকাটা ক্লাবের সন্ধ্যেটার কথা মনে পড়তে লাগল। এলা নামের মেয়েটি কী অদ্ভুত! তার মেয়ের প্রায় সমান। চুমকির সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছে। সেই মেয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে মদ খায় না শুধু, স্পষ্ট তাকে সিডিউলস করার চেষ্টা করেছে। চকচকে স্থির দৃষ্টি মেলে ঠোঁটটা কাঁপাচ্ছিল।

এলার ব্যাপারটা সুজাতাকে বলা হয়নি বলে জ্ঞানব্রত একটু অপরাধী বোধ করছেন। স্ত্রীর কাছে কোনো কিছু লুকোনো তাঁর স্বভাব নয়। তাঁর কোনো গোপন জীবন নেই! থাক, পরে বললেও চলবে।

মাঝরাতে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন জ্ঞানব্রত। তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। এখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। তারপর ভালো করে চোখ মেলে দেখলেন সুজাতার খাটে তখনও আলো জ্বলছে, আর কয়েক পৃষ্ঠা বাকি বইটার। সুজাতা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, লালন ফকির?

শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার উঠলে যে, জল খাবে?

জ্ঞানব্রত বললেন, এবার মনে পড়েছে। ওটা লালন ফকিরের গান।

এবার সুজাতা অবাক না হয়ে পারল না। সামান্য একটু ভুরু তুলে বলল, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওই গানটার কথা ভাবছ?

হ্যাঁ, একটা স্বপ্ন দেখলুম-ছেলেবেলায় এই গানটা আমি প্রায়ই শুনতুম এক বুড়োর মুখে...আমি জানি এটা লালন ফকিরের গান...।

সুজাতা অনেকগুলো বছর বিদেশে কাটিয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। তবে ফ্যাশান অনুযায়ী সে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে উপযুক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ফিলম দেখে। লালন ফকিরের নামও সে শোনেনি। কখনো কোথাও শুনে থাকলেও তার মনে ওই নাম কোনো রেখাপাত করে না।

কোনো কথা না বলে সুজাতা অপেক্ষা করে রইল। হলই-বা একটা বিদঘুটে, গেঁয়ো গান লালন ফকির নামে কোনো একজনের লেখা বা সুর দেওয়া, কিন্তু তাই নিয়ে মাঝ রাতে ঘুম ছেড়ে আলোচনা করতে হবে? এটা তো ঠিক স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি তো কখনো এ-রকম করেন না।

আমি বাজি ফেলে বলতে পারি এটা লালন ফকিরের গান!

তুমি কার সঙ্গে বাজি ধরতে চাইছ?

এতক্ষণে পুরোপুরি ঘোর কাটল। সত্যিই তো, তিনি প্রায় পাগলের মতন ব্যবহার করছেন।

ওঃ হো:! তোমায় ডিস্টার্ব করলুম। কত রাত হল, তুমি এখনও ঘুমোওনি?

আমি আর তিন-চার পাতা শেষ করব।

আর আধ ঘণ্টা পরে একই ঘরের দু-টি খাটে দু-জন নারী-পুরুষ দু-রকম দু-টি স্বপ্ন দেখল। একজন প্যারিসের মঁমার্ত অঞ্চলের, যেখানে ইন্সপেক্টর মেইগ্রে এইমাত্র এক

কোটিপতি বাউণ্ডুলেকে স্ত্রী-হত্যার দায়ে গ্রেফতার করলেন। আর একজন দেখল বাংলার এক অতিসাধারণ পাড়াগাঁর। সেখানে দু-তিনটি শিশু লুকোচুরি খেলছে এক আমবাগানে।

পরদিন সকালে ঠিক সেই ছ-টাতেই ঘুম ভাঙল জ্ঞানব্রতর। রুটিন মেলানো প্রত্যেকটি কাজ করে যেতে লাগল। তবু মনের মধ্যে একটা অস্থির অস্থির ভাব। খেতে বসবার আগে সাতটি টেলিফোন এবং তিন জন দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে কাজের কথা বলতে হল তাঁকে, তবু সেই ছটফটানিটা গেল না।

খাবার টেবিলে সুজাতা ঘুম ভেঙে উঠেই ছুটে এল যথারীতি। উজ্জয়িনীও আজ এই সময় ব্রেকফার্স্ট খেতে টেবিলে এসে বসেছে। মেয়েকে আজ একটু বেশি করে লক্ষ করতে লাগলেন জ্ঞানব্রত।

এই উজ্জয়িনীরই সহপাঠিনী এলা। উজ্জয়িনী বলেছে রবিবারে ব্যাণ্ডেলে পিকনিক করতে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সত্যি ব্যাণ্ডেলে যাবে, না কোনো হোটেলে গিয়ে মদ খাবে, পুরুষমানুষ সম্পর্কে ওর কি এর মধ্যেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে? না, না, সব মেয়ে একরকম হতে পারে না।

তুই এলা নামে কারুকে চিনিস?

মা আর মেয়ে দু-জনেই অবাক হল। সুজাতার মুখে অবশ্য তার কোনো রেশ নেই, কিন্তু উজ্জয়িনী তো এখনও ঠিক লেডি হয়নি, তাই সে বেশ চমকে গেল। তার বাবার মুখ থেকে এই ধরনের প্রশ্ন সে এই প্রথম শুনল।

এলা? কোন এলা?

সরকার না চ্যাটার্জি কী যেন বলল পদবিটা, ঠিক মনে নেই। তোর সঙ্গে ব্রেবোর্নে কোনো এক বছরে পড়েছে।

এলা কে? না তো। ওই নামে তো কাউকে মনে করতে পারছি না। ভালো নাম কী?

এটাই নিশ্চয় ভালো নাম, আমাকে শুধু ডাকনাম বলবে কেন? বলল যে একবার নাকি আমাদের এবাড়িতেও এসেছে?

তুমি তাকে কোথায় দেখলে?

ক্যালকাটা ক্লাবে...আমার একজন চেনা লোকের কাজিন হয় বলল। আমাকে আগে দেখেছে, তোর খুব চেনা।

আমাকে-ও, এলা। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি, মোটে এক বছর পড়েছিল, তারপর তো অনেকদিন আর দেখিনি।

তোরা ব্যাণ্ডেল যাচ্ছিস এই রোববার?

হ্যাঁ। বাবা, তোমার গাড়িটা দেবে সে-দিন?

ক-জন যাবি? ইচ্ছে করলে কারখানার একটা স্টেশন ওয়াগন নিতে পারিস।

আমরা ছ-জন। অ্যাম্বাসাডারেই হয়ে যাবে।

ড্রাইভার চাই? না, তোর বন্ধুদেরই কেউ চালাবে?

সুজাতা বলল, না, না, ওরা বড্ড জোরে চালায়...জ্ঞান সিং থাকুক ওদের সঙ্গে...

উজ্জয়িনী একবার তাকাল মায়ের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, মা! তুমি কেমন আস্তে গাড়ি চালাও!

একথা ঠিক সুজাতার হাতে স্টিয়ারিং পড়লে আর রক্ষা নেই। ইউরোপের ট্রাফিক আর কলকাতার ট্রাফিক যে এক নয়, সে-কথা তার মনে থাকে না। দু-বার ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, তবু সুজাতা কম স্পিডে গাড়ি চালাতে পারে না।

সুজাতা বলল, আমি তো ওইজন্যই এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছি।

জ্ঞানব্রত বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলেন। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তিনি মিথ্যে সন্দেহ করছিলেন। চুমকির মুখটা কত সরল, মোটেই ও এলার মতো নয়। বাড়ির গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে নির্দোষ পিকনিকে।

কারখানা থেকে অফিসে আসবার পর তিনি রেডিয়ো স্টেশনে ফোন করলেন। মি. বড়ুয়া, আমি জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি। আজ আবার আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করছি।

মি. চ্যাটার্জি? বলুন, বলুন, লাস্ট ইভনিং ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল, খুব জমেছিল-ওই মেয়েটি আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল আমার কাছে।

কোন মেয়েটি।

ওই যে এলা সরকার। রেডিয়োতে চান্স চায়-আপনার রেফারেন্সে এসেছে যখন, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি মাঝপথে বাধা দিতে গেলেও বড়ুয়া সাহেব থামলেন না।

জানেনই তো মি. চ্যাটার্জি আমাদের এখানে কিছু কিছু ফর্মালিটি তো আছেই, আমি নিজে গানটান খুব-একটা বুঝি না, ওকে একবার অডিশান দিতে হবে-আমাদের একটা মিউজিক বোর্ড আছে-তবে হয়ে যাবে, ওর ঠিক হয়ে যাবে, দেখলেই বোঝা যায় ট্যালেন্টেড, আপনি নিশ্চিত থাকুন, এজন্য আর ফোন করবার দরকার ছিল না।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি বলতে চাইলেন যে, তিনি এলা নামের ওই মেয়েটিকে মোটেই পাঠাননি। এবং তার জন্য ফোনও করছেন না।

মেয়েটা দারুণ কেরিয়ারিস্ট তো! কালকের আলাপের সুযোগ নিয়ে আজ সকালেই বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করেছে!

কিন্তু এসব কথা তিনি টেলিফোনে বললেন না। এলা মেয়েটিকে তিনি পাঠাননি ঠিকই। তবে ওই মেয়েটি যদি এইভাবে রেডিয়োতে গান গাইবার সুযোগ পায় তাতে তিনি বাধাই-বা দেবেন কেন? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ও যা পারে করুক।

মি. বড়ুয়া, আমি ফোন করছি আরও একটা কারণে...কাল সন্ধ্যে বেলা এই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেই-শেষপর্যন্ত আর বলাই হল না-হয়তো আপনি মনে করবেন খুবই পিকিউলিয়ার রিকোয়েস্ট।

কী ব্যাপার? আপনি এত হেজিটেট করছেন কেন?

এটা আমার বাতিকও বলতে পারেন। কাল সকাল দশটা আন্দাজ, না ঠিক দশটাই হবে। একজন একটা পল্লিগীতি গাইছিল। সেই গায়কের নামটা আমি জানতে চাই। বেতার জগতে নাম ছাপা নেই, আমি এক কপি বেতার জগত কিনে দেখলুম আজ।

কোন চ্যানেলে।

মানে!

শর্ট ওয়েভে? বিবিধ ভারতী?

তা জানি না। ইন ফ্যাক্ট, রেডিয়ো বাজছিল পাশের বাড়িতে...গানের লাইনগুলো ছিল এইরকম :

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগল পারা...

গানটি শুনে বড়ুয়া সাহেবও যে রীতিমতন অবাক হয়েছেন, তা টেলিফোনের এপাশ থেকেও বোঝা যায়। তিন বার জিজ্ঞেস করলেন কী গান? মুম্বাই শহরে। দাঁড়ান, দাঁড়ান, লিখে নিই।

তারপর তিনি বললেন, এই গানের গায়কের নাম আপনি জানতে চান?

হ্যাঁ। সম্ভব হলে তার বাড়ির ঠিকানাও।

...নো প্রবলেম। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনাকে রিং ব্যাক করে জানিয়ে দিচ্ছি।

এদেশে যাদের নামের সঙ্গে সাহেব যুক্ত থাকে, তারা অন্তত একটা ব্যাপারে সাহেবদের মতন নন। তাঁদের পনেরো মিনিট মানে দেড় ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা বাদে বড়ুয়া সাহেব ফোন করে জানালেন যে ওই গানের গায়ক একজন আনকোরা নতুন শিল্পী, তার নাম শশীকান্ত দাস। ঠিকানাটা এই...।

ঠিকানাটা কাগজে লিখতে লিখতে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলেন, এই জায়গাটা কোথায়?

বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তা কী করে জানব বলুন, উনি তো কখনো আমাকে ওঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেননি! কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি এই লোকটিকে নিয়ে কী করবেন?

ওর কাছ থেকে গানটা শিখব! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। বড়ুয়াকে আর কোনো কথা না বলতে দিয়ে জ্ঞানব্রত ফোন রেখে দিলেন।

আজ সারাপৃথিবীতে তাঁর যত কাজই থাক, তবু একবার এই শশীকান্ত দাসের সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

রেডিয়ো স্টেশনের পি সি বড়ুয়া যে ঠিকানাটি দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি খুঁজে বার করতে খুব বেশি অসুবিধে হল না। বাগবাজারের কাছে একটা গলির মধ্যে মেসবাড়ি। এটা যে মেসবাড়ি, তা দরজা দিয়ে ভেতরে এক-পা বাড়ালেই টের পাওয়া যায়। এইসব বাড়িতেই একটা উগ্র পুরুষ পুরুষ গন্ধ থাকে।

অনেক কালের বাড়ি, সিঁড়িগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, রেলিং নড়বড়ে। দো-তলার বারান্দায় একটা তারে নানান রঙের লুঙি শুকোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত এসেছেন সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু এখনো এবাড়ির বাসিন্দারা সবাই ফিরে আসেনি। চুপচাপ, খালি খালি ভাব, সদর দরজাটা হাট করে খোলা, এক-তলাতে এক জনও লোক নেই! জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

মাঝপথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। লোকটির গায়ের রং মিশমিশে কালো, রোগা লম্বাটে চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। লোকটি পরে আছে শুধু একটা গামছা।

তাকে এই মেসের কোনো ভৃত্য কিংবা রান্নার ঠাকুর মনে করে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করল, ওহে, শশীকান্ত দাস কোন ঘরে থাকেন বলতে পারো?

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ে তাকাল জ্ঞানব্রতর দিকে।

তারপর আমতা আমতা করে বলল; আজ্ঞে...আমিই শশীকান্ত..।

জ্ঞানব্রত একটু হাসলেন। তিনি এমন কিছু অন্যায় করেননি। এই ঘটনার আরও অনেক ক্লাসিক উদাহরণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে খালি গায়ে দেখে একজন আগন্তুক জিজ্ঞেস করেছিল, ওহে, বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন কিনা বলতে পারেন? বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল সম্পর্কেও এরকম গল্প আছে। তবু বঙ্কিমবাবু ছিলেন সুপুরুষ। বিদ্যাসাগর বা মাইকেলের তুলনায় এই লোকটিকে বেশ সুদর্শনই বলতে হবে। গায়ের রং কালো হলেও ছিপছিপে মেদবর্জিত শরীর। ভালো করে মেকাপ দিয়ে, মাথায় একটা পালকের মুকুট পরিয়ে দিলে অনায়াসেই যাত্রাদলের কেষ্টঠাকুর সাজানো যায়।

জ্ঞানব্রত বললেন, ও, আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

লোকটির বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। জ্ঞানব্রতর চেহারায়, ব্যক্তিত্বে ও পোশাকে বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ব্যাপার আছে। এইরকম মানুষ সচরাচর শশীকান্ত দাসের মতন লোকের কাছে যেচে দেখা করতে আসে না।

শশীকান্ত বলল, আজ্ঞে আমি তো আপনাকে স্যার ঠিক চিনতে পারলাম না...!

জ্ঞানব্রত বললেন, আগে তো আলাপ হয়নি, চিনবেন কী করে? আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

দরকারের কথা শুনে শশীকান্ত আরও বিভ্রান্ত। তার বুকের মধ্যে একই সঙ্গে দারুণ বিপদের ভয় কিংবা দারুণ কোনো সুসংবাদের আনন্দের জোয়ার-ভাটা চলছে।

আমার সঙ্গে স্যার আপনার দরকার..বলুন স্যার।

জ্ঞানব্রতর হাবভাব খুব বেশি সাহেবি ধরনের। বছরে দু-তিনবার তাঁকে ইউরোপ আমেরিকা যেতে হয়। তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে রাখেন, কখনো একটু কাশতে হলে মুখের সামনে হাত চাপা দেন। প্রকাশ্যে কোনোদিন তিনি হাই তোলেননি কিংবা হেঁচে ফেলেননি। খাওয়ার পর ঢেকুর তোলা তার কাছে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

সেইরকমই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাজের কথা বলাও তাঁর পক্ষে একটা চরম অভদ্রতার ব্যাপার।

আপনার ঘর কোনটা?

ওই যে স্যার, সিঁড়ির ডানপাশেই সাত নম্বর।

আপনি আমায় মিনিট দশেক সময় দিলে আপনার ঘরে বসে একটু কথা বলতুম।

নিশ্চয়ই স্যার, চলুন স্যার।

শশীকান্তর সঙ্গে সিঁড়ির দু-তিন ধাপ ওঠার পর জ্ঞানব্রত আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি স্নান করতে যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ স্যার! সকালে জল পাওয়া যায় না, সবাই অফিস যায়, দশটার মধ্যেই চৌবাচ্চা খালি...তাই আমি বিকেলেই...

-ঠিক আছে। আপনি স্নান করে আসুন, আমার তাড়া নেই। আমি আপনার ঘরে অপেক্ষা করছি।

-না, না, স্যার, আমি পরে চান করব। একদিন চান না করলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু জ্ঞানব্রতর পক্ষে গামছা-পরা খালি গায়ে একজন লোকের দিকে সামনাসামনি তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। তাঁর রুচিতে বাঁধে।

এবার তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, না, এখনই আগে স্নান সেরে আসুন!

শশীকান্ত তবু ওপরে উঠে এসে সাত নম্বর ঘরের তালা খুলে, দরজাটা হাট করে বললে, আপনি ভেতরে বসুন। তবে, স্যার, আমি দু-মিনিটের মধ্যে চান করে আসছি।

লোকটি বুদ্ধি করে এবার একটা লুঙ্গি ও জামা সঙ্গে নিয়ে গেল।

শশীকান্তের ব্যবহারে এর-মধ্যেই জ্ঞানব্রত একটু দুঃখিত হয়েছেন। ও একজন গায়ক, একজন শিল্পী, ও কেন একজন অচেনা লোকের সঙ্গে এমন স্যার স্যার বলে কথা বলবে সব শিল্পীরই আত্মাভিমান থাকা উচিত।

ঘরখানা স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার। এ-রকম ঘরে জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি বহুদিন ঢোকেননি। এ রকম অস্বাস্থ্যকর ঘরেও মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকে তাই না? তারাও হাসে, ফুর্তি করে এবং ভবিষ্যৎ কালে মানুষদের জন্ম দেয়।

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি খাট, তার মধ্যে দু-টি খাটের বিছানা গোটানো। অন্য বিছানাটি পাতাই রয়েছে। তার চাদরটা তেল চিটচিটে। সম্ভবত ওই বিছানাটা শশীকান্তর। দেয়ালে দুটি ক্যালেণ্ডার ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। অন্ধকারটা একটু চক্ষে সইতে জ্ঞানব্রত দেখতে পেলেন, দু-দিকের দেয়ালে দু-টি আলনাও রয়েছে, তাতে জামাকাপড় ডাঁই করা।

একটি বিছানা গুটোনো খাটে জ্ঞানব্রত বসলেন অতিসন্তর্পণে। সারাঘর জুড়ে রয়েছে বিশ্রী গন্ধ, অনেকটা পচা চামড়ার গন্ধের মতন। এক-পায়ের ওপর আর এক-পা তুলে জ্ঞানব্রত পায়ের ডগাটি নাড়তে লাগলেন।

সিগারেটের তৃষ্ণাটা এইসময় তীব্র হয়ে ফিরে এল। একা কোথাও বসে কারুর জন্য অপেক্ষা করায় সিগারেটের অভাবটা বেশি অনুভব করা যায়।

দু-মিনিট না হোক, প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল শশীকান্ত। হুড়ুস-ধাড়ুস করে গায়ে জল ঢেলেই সে ছুটে এসেছে। ভিজে চুল ঝুলছে মুখের চারপাশে।

আপনি চা খাবেন স্যার?

জ্ঞানব্রত প্রথমে বললেন, না, তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি আগে চুল আঁচড়ে নিন।

জ্ঞানব্রত প্রথমে ঠিক হুকুম করতে না চাইলেও তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তাঁর গলায় সেইরকম একটা সুর ফুটে ওঠে। প্রত্যেক দিন অনেকগুলি মানুষ তাঁর আদেশ মেনে কাজ করে। সেই জন্যই জ্ঞানব্রতর এইভাবে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে।

শশীকান্ত একটা খাটের তলায় উঁকি দিয়ে টেনে আনল একটা কাঠের আয়না-চিরুনি। তা দিয়ে ঝটাপট চুল আঁচড়ে ফেলল।

শশীকান্ত একটা সবুজ লুঙির ওপর পরেছে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। এ-রকম রঙের অসামঞ্জস্যে জ্ঞানব্রতর চক্ষুকে পীড়া দেয়। তবু তিনি মুখে পাতলা হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন।

আপনি রেডিয়োতে গান করেন?

হ্যাঁ স্যার। আপনি কি রেকর্ড কোম্পানি থেকে এসেছেন?

না। আমার সঙ্গে ওসবের কোনো সম্পর্ক নেই। একদিন রেডিয়োতে আপনার একটা গান শুনে...ইয়ে আমায়...।

জ্ঞানব্রত ঠিক শব্দটি খুঁজে পেলেন না। বস্তুত দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলা কথার মধ্যেও মিশে যায় ইংরেজি, পরপর দু-তিনটে টানা বাংলা বাক্য বলার অভ্যেস তাঁর নেই।

তিনি সংক্ষেপে বললেন, ভালো লেগেছিল।

কোন গানটা স্যার!

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে...করিয়ে পাগলপারা...।

ও, ওখানা বড়ো ভালো গান স্যার! সকলেরই ভালো লাগে।

লালন ফকিরের, তাই না?

-ঠিক ধরেছেন স্যার! তবে লালন ফকিরের গানের কপিরাইট নেই। রেডিয়োর লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল...

জ্ঞানব্রত একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেললেন।

তারপর পকেট থেকে একটা ছোটো বাক্স বার করে খুললেন। সেটির মধ্যে রয়েছে একটি নতুন হাতঘড়ি।

বাক্সটি শশীকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে জ্ঞানব্রত অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনার গান শুনে আমার ভালো লেগেছিল সেইজন্য সামান্য একটি উপহার এনেছি। আপনি নিলে আমি খুব খুশি হব।

শশীকান্ত নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন! রেডিয়োতে একখানা গান শুনে কেউ এসব দামি জিনিস উপহার দিতে পারে? রেডিয়োতে তো সবাই বিনা পয়সায় গান শোনে। পুরো একদিনের প্রোগ্রামের জন্য রেডিয়ো থেকে সে পায় পঞ্চাশ টাকা মাত্র। আর এই ভদ্রলোক একখানা গান শুনে দিচ্ছেন একটা ঘড়ি। এর দাম পাঁচ-শো না হাজার কে জানে!

এটা সত্যিই আমায় দিচ্ছেন স্যার?

আপনার জন্যই এটা এনেছি।

বস্তুত এটাও জ্ঞানব্রতর সাহেবি ব্যবহারেরই একটা অঙ্গ। এদেশের লোক অন্য লোকের সময়ের দাম দিতে জানে না। যখন-তখন অন্যের বাড়িতে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট করতে কারুর বাধে না। কিন্তু নিজের গরজে কারুর কাছে গেলে তার বিনিময়ে কিছু দেওয়া উচিত। জ্ঞানব্রত তো নিজের গরজেই এসেছেন।

শশীকান্ত মুগ্ধভাবে ঘড়িটি দেখছে। সেদিক থেকে তার চোখ ফেরাতে পারছে না। বোঝাই যায় সে কখনো নিজস্ব হাতঘড়ি হাতে পরার সুযোগ পায়নি।

আমার একটা উপকার করবেন?

চমকে উঠে শশীকান্ত বলল, কী, বলুন, স্যার?

সেদিন রেডিয়োতে আপনার ওই গানটা আমার পুরোপুরি শোনা হয়নি। যতটা শুনেছিলাম তাও মনে নেই। ওই গানটি আমাকে আর একবার গেয়ে শোনাবেন?

এখন শুনবেন, স্যার; এখানে মিউজিক-টিউজিক কিছু নেই, রেডিয়ো স্টেশনে ওদের সব ব্যবস্থা থাকে। আচ্ছা। আমি খালি গলাতেই শোনাতে পারি অবশ্য–

হঠাৎ জ্ঞানব্রতর মনে হল, মেসের এই গুমোট-অন্ধকার ঘরে বসে ওই গানটা শুনলে তাঁর ভালো লাগবে না। বরং আরো ভালো লাগাটা কেটে যাবে।

তিনি হাত তুলে বললেন, থাক। এখন থাক। এক কাজ করলে হয় বরং...একদিন আমার বাড়িতে গিয়ে ওই গানটা গাইবেন। তাহলে টেপে তুলে রাখতে পারি। যাবেন আমার বাড়িতে?

শশীকান্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়ে বলল, নিশ্চয়ই যাব, স্যার। কোথায় আপনার বাড়ি? কবে যাব?

কোটের পকেট থেকে জ্ঞানব্রত নিজের একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, এতে সব লেখা আছে।

যদি শশীকান্ত ইংরেজি না পড়তে পারে, সেইজন্য তিনি মুখেও নির্দেশ দিয়ে দিলেন তার বাড়ির অবস্থান সম্পর্কে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কাল থেকে এই রবিবারের মধ্যে যেকোনো দিন সন্ধ্যে বেলা আসতে পারেন। সাতটার পর থেকে আমি বাড়িতে থাকব।

কালই যাব স্যার।

আপনি এ গান কার কাছ থেকে শিখেছেন?

কুষ্টিয়ায় যখন ছিলাম, তখন বাবন সাঁইয়ের কাছ থেকে শিখেছিলাম। বাবন সাঁই অনেক শিখিয়েছেন আমায়। তিনি খোদ লালন ফকিরের শিষ্য!

কুষ্টিয়া?

হ্যাঁ স্যার। সেখানেই আমার বাড়ি।

এখানে এসেছেন কবে?

এসেছি তো স্যার দুই বৎসর আগে...তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছি। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। এখানে এই ঘরে পরেশ রায় থাকেন। তিনি আমাদের গ্রামের লোক, তিনি দয়া করে কিছুদিনের জন্য আমায় থাকতে দিয়েছেন। তা অন্য যে একজন আছেন তিনি পছন্দ করেন না আমায়। তিনি এক ঘরে তিন জন থাকা নিয়ে ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করেছেন।

আপনার বাড়ির অন্য লোকজন কোথায়?

আমার মা-বাবা কেউ নেই, স্যার। আর দু-চার মাস পরে আমি নিজেই একখানা ঘর ভাড়া করতে পারব মনে হয়। রেডিয়ো আর্টিস্ট হবার পর দু-চার জায়গায় ফাংশানে চান্স পাই স্যার। পঁচাত্তর টাকা করে দেয়।

কুষ্টিয়ার কোন গ্রামে ছিল আপনার বাড়ি?

কুমারখালি। আপনি কুমারখালি গ্রামের নাম শুনেছেন, স্যার? কুমারখালিতে থানাও আছে।

যেন একটা বিদ্যুৎ চমকাল জ্ঞানব্রতর মাথার মধ্যে। তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর দাদামশাইয়ের মুখখানা। লম্বা চেহারা, সারামুখে দাড়ি। সম্রাট শাহজাহানের মতন পেছনে দু টি হাত দিয়ে পায়চারি করতেন লম্বা টানা বারান্দায়, আর মুখে প্রায় সবসময়ই থাকত গুনগুন গান। গান-বাজনার দারুণ ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই দাদামশাইয়ের মুখেই জ্ঞানব্রত এই গানটা শুনেছেন অতিশৈশবে। ক-দিন ধরে সেই কথাটাই মনে করতে পারছিলেন না।

হ্যাঁ একথাও মনে পড়ছে যে, দাদামশাইয়ের কাছে প্রায়ই একজন ফকির এসে গান শোনাতেন। দু-জনে বন্ধুত্ব ছিল খুব। সেই ফকিরই কি বাবন সাঁই।

জ্ঞানব্রত অনেকটা আপন মনেই বললেন, কী আশ্চর্য যোগাযোগ? ওই কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে আমিও থাকতাম!

আপনার বাড়ি কুমারখালিতে, স্যার? কোন বাড়ি?

আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি, সেখানেই আমি বেশি থেকেছি। আমার দাদামশাই ছিলেন সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি। খুব নামকরা বাড়ি।

জ্ঞানব্রত সেখানে ছিলেন মাত্র ন-বছর বয়েস পর্যন্ত। সেইসময় দাদামশাই মারা যান। তারপর এগারো বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ। তারপর থেকে অনেকগুলো দুঃখকষ্টের বছরের কথা স্পষ্ট মনে আছে জ্ঞানব্রতর, কিন্তু তার আগের কথা কিছুই মনে পড়ে না। অথচ সেইসময়টা ছিল কত সুখের।

অনেকের তো দু-তিন বছর বয়েসের কথাও কিছু কিছু মনে থাকে। অথচ জ্ঞানব্রতর শৈশবটা নিশ্চিহ্ন। শুধু একটা গান, সেইসময় শোনা একটা গান এতদিন পরে ফিরে এল।

জ্ঞানব্রত সেই ধরনের মানুষ নন যে তিনি একসময় কুষ্টিয়ায় ছিলেন বলেই আর একজন কুষ্টিয়ার লোককে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরবেন আনন্দে। ও-রকম দেশোয়ালি প্রীতি তাঁর নেই। বস্তুত পূর্ববাংলা সম্পর্কে তীব্র কোনো নস্টালজিয়াও তিনি বোধ করেন না। মানুষ বাঁচে বর্তমান নিয়ে, হঠাৎ জ্ঞানব্রত শশীকান্তকে বললেন, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

শশীকান্ত আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

আপনার বাক্স-বিছানা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে। আপনার থাকবার জায়গার অসুবিধে বলছিলেন, আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন।

আপনার বাড়িতে থাকব, স্যার?

হ্যাঁ।

আজই?

তাতে অসুবিধে কী আছে?

পরেশদাকে কিছু বলে যাব না?

ওকে চিঠি দিয়ে যান। পরে আর একদিন এসে সব বুঝিয়ে বলবেন। আমার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে। আপনার অসুবিধে হবে না।

না, না, আমার আর কী অসুবিধে, আমি যেখানে-সেখানে থাকতে পারি...কিন্তু, সত্যি বলব স্যার? কেমন কেমন সব লাগছে। মনে হচ্ছে যেন রূপকথা। আপনি এসে আমায় একটা ঘড়ি দিলেন, তারপর বললেন, আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন, এও কি সম্ভব?

জ্ঞানব্রত এবার বেশ জোরে জোরে হাসলেন!

তারপর বললেন, আপনাদের এই গলির মোড়ে আমার গাড়ি আছে। আমি সেখানে অপেক্ষা করছি! আপনি তৈরি হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।

শশীকান্তকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত।

নিজের বাড়িতে এসে শশীকান্তকে নিয়ে সরাসরি উঠে এলেন দো-তলায়।

এখানে একটি গেস্ট রুম সারাবছর সাজানোই থাকে। অতি নিকটাত্মীয় কেউ এলে তবেই তাকে রাখা হয় এই দো-তলার ঘরে। এ ছাড়া এক-তলায় আরও দু-টি ঘর আছে।

শশীকান্তকে ঘর এবং সংলগ্ন বাথরুম দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞানব্রত, এই সময় সুজাতা এসে সেখানে দাঁড়াল। যতই অবাক হোক, মুখে তার কোনো চিহ্ন ফোটাবে না সুজাতা, তবু মনে মনে সে ভাবছে, হঠাৎ কী হল মানুষটার? গত কয়েকদিন ধরে যেরকম ব্যবহার করছে তা কিছুতেই তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। এইরকম একটা কাঠের মিস্ত্রি টাইপের লোককে ধরে এনে দো-তলার ঘরে রাখতে চায়।

জ্ঞানব্রত স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, সুজাতা, ইনি একজন শিল্পী এর নাম শশীকান্ত দাস, আজ থেকে ইনি আমাদের এখানে থাকবেন। দেখো, যেন এর কোনো অযত্ন না হয়।

শশীকান্ত এগিয়ে এসে সুজাতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সুজাতা আরে আরে বলে দু-তিন পা পিছিয়ে গেল।

জ্ঞানব্রত বললেন, উজ্জয়িনী কোথায়? ওর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিতে চাই।

পরদিনই জ্ঞানব্রত চলে গেলেন মাদ্রাজে।

বাড়িতে যে কী একটা গন্ডগোলের সৃষ্টি করে গেলেন, তা জ্ঞানব্রত খেয়ালও করলেন না। কয়েকটা দিন তিনি একটু পাগলামিতে মেতে ছিলেন; কিন্তু কোম্পানির নানান কাজে তাঁকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাকছে।

মাদ্রাজ থেকে দিল্লি, সেখান থেকে উলটে আবার ব্যাঙ্গালোর, তারপর মুম্বাই। অর্থাৎ সাতদিনে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল ওড়াউড়ি করতে হল জ্ঞানব্রতকে।

এদিকে বাড়িতে এক অদ্ভুত অতিথি।

প্রথম গোলমাল শুরু হল সকাল আটটায়।

সুজাতা কোনোদিনই ন-টার আগে জাগে না। এখন স্বামী কলকাতায় নেই, এখন তো আরও বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো যায়। কাল রাতে সুজাতা স্লিপিং পিল খেয়ে শুয়েছে। তবু আটটার সময়েই তার ঘরের দরজায় দুম দুম ধাক্কা।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘুমজড়িত চোখে দরজা খুলে সুজাতা জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার!

সুজাতার শিক্ষাদীক্ষা এমনই যে, সে কোনো কারণে বিরক্ত হলেও প্রথমেই ঝি-চাকরের ওপর ধমকে ওঠে না, কিংবা বাড়িতে ডাকাত-পড়া অথবা আগুন-লাগার মতন বিচলিত হয়ে ওঠে না যখন- তখন।

সারদা এবাড়ির বাসনপত্র মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়। সে প্রায় চোখ কপালে তুলে বলল, ও দিদিমণি! ওঘরের বিছানায় কে একটা ডাকাতের মতন লোক ঘুমিয়ে আছে? কী সাংঘাতিক কথা! শিগগির পুলিশে খবর দাও।

মাথায় ঘুমের নেশা, সুজাতার আগের রাত্রির কথা স্পষ্ট মনে পড়ল না। সারদা আঙুল তুলে গেস্ট রুমটা দেখাল। সেখানে একজন লোক ঘুমিয়ে আছে! কে?

বাবু কোথায়?

বাবু তো ভোর বেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখন সুজাতার মনে পড়ল, জ্ঞানব্রতর আজ সকাল ছটা দশের ফ্লাইট ধরার কথা। নিশ্চয়ই পাঁচটার মধ্যে গেছে। এসব দিনে জ্ঞানব্রত কখনো স্ত্রীকে ডাকেন না।

কিন্তু গেস্ট রুমে কে শুয়ে থাকবে?

রতন কোথায়?

রতন দুধ আনতে গেছে, এখনও আসেনি।

এবাড়ির কাজের লোকরা রাত্তিরে সবাই নীচে থাকে। সিঁড়ির মাঝখানে একটা লোহার গেট থাকে। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় রাত্রে। রোজ ভোরে জ্ঞানব্রত সেই গেট খুলে দেন। তিনি কলকাতার বাইরে থাকলে এই সারদা এসে রাত্রে শুয়ে থাকে দো-তলার বারান্দায়।

পাতলা নাইটি পরে থাকে সুজাতা। ঘরের মধ্যে ফিরে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরোলেন। তারপর গেস্ট রুমের দিকে কয়েক-পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন। এবার সব মনে পড়ে গেছে। সেই রাধাকান্ত না শশীকান্ত কী যেন, সেই লোকটি নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রত যাকে কাল রাত্রে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

সুজাতা হেসে জিজ্ঞেস করল, কালো মতন একটা লম্বা লোক তো?

সারদা বলল, হ্যাঁ গো দিদিমণি। দেখলে ভয় করে।

ভয়ের কিছু নেই। বাবুর চেনা লোক। জেগে উঠলে চা দিস। সুজাতা আবার ফিরে গেল নিজের বিছানায়।

যাদের জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে না, তারা প্রায়ই কোনো রোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে ভাবতে ভালোবাসে।

সারদা ধরেই নিয়েছিল যে, কোনো হুমদো চেহারার চোর এবাড়িতে ঢুকে পড়ে, তারপর মনের ভুলে ঘুমিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে ওকে আটকে সবাই মিলে চেঁচিয়ে, পুলিশ ডেকে বেশ একখানা জমাট ব্যাপার হবে। সেসব কিছুই হল না। এ-রকম উটকো চেহারার লোক বাবুর চেনা। বাবুদের বিছানায় শোবে? সারদার স্বামীও তো এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল, সে কোনোদিন বাবুদের গদিতে শোওয়ার কথা কল্পনাও করেনি।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সারদা এবার নির্ভয়ে অতিথির ঘরে ঢুকল। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, মুখে মেচেতার দাগ, তবু সারদাকে দেখলে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের গিন্নি হিসেবে অনেকের মনে হতে পারে। বেশ পরিষ্কার একটি

সাদা শাড়ি পরা। এ বাড়ির দাস-দাসীরা ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকবে, এই সুজাতার নির্দেশ। ওদের জামাকাপড় কিনে দিতে সুজাতার কোনো কার্পণ্য নেই।

শশীকান্ত অঘোরে ঘুমোচ্ছে। খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে তার একটা পা। তার শোয়ার ভঙ্গিতেও গ্রাম্যতা আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারেনি। ঘুমোনো সহজ না কি? তার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। নরম বিছানায় শুয়ে শুয়েও উত্তেজনায় তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কী হয়ে গেল ব্যাপারটা! এসব স্বপ্ন নয় তো? মাঝে মাঝে উঠে উঠে সে হাতঘড়িটা দেখছিল। এই ঘড়িটাও সত্যি, তার নিজস্ব ঘড়ি। ঠিক যেন সোনা দিয়ে তৈরি।

শেষ রাতে সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারদা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি জোরে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল। তাতেও লোকটার ঘুম ভাঙল না দেখে সে জিনিসপত্র সরাতে লাগল খটাখট শব্দে। এসময় শশীকান্ত চোখ মেলে তাকাতেই সারদা ঘুরিয়ে নিল নিজের মুখটা। একটাও কথা বলল না সে লোকটার সঙ্গে। শুধু সে যে লোকটিকে পছন্দ করেনি, এটাই বুঝিয়ে দিতে চায়।

শশীকান্তও সারদার সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল না।

সুজাতার ভাঙা ঘুম আর জোড়া লাগেনি। আরও কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করার পর ডাকলেন, রতন! রতন!

রতন ততক্ষণে দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। চায়ের জলও চাপানো আছে। রতন! সুজাতা ডাকা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে আসতে হয়। খুব পাতলা চা দু-তিন কাপ খায় সুজাতা।

রতন চায়ের ট্রে এনে সাজিয়ে দিল সুজাতার বেড- সাইড টেবিলে।

ওই যিনি গেস্ট রুমে আছেন, তাঁকে চা দিয়েছিস?

না।

উনি জেগেছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে চা দিসনি কেন?

ও চা খায় কি-না তা তো আমি জানি না।

সুজাতা হাসল। রতনের মুখখানা ঘোঁজ হয়ে আছে। রতনের মনের ভাব বুঝতে সুজাতার একটুও অসুবিধে হয় না।

রতনের চেহারা ও পোশাক ওই লোকটির থেকে অনেক বেশি উচ্চাঙ্গের। ওইরকম একটি লোককে ডেকে এনে বাবুদের বিছানায় শোওয়ানো হবে, এটা সে পছন্দ করবে কেন? এ রকম লোককে সেবা করতেও সে অরাজি।

ওকে জিজ্ঞেস কর। উনি যদি চা না খান, তাহলে এক কাপ দুধ দে। উনি খুব ভালো গান করেন।

আজদুপুরেও এখানে খাবেন?

খাবেন তো নিশ্চয়ই। উনি এখানে বেশ কয়েকদিন থাকবেন। তোদের বাবু তাই তো বলে গেছেন।

এবার সুজাতা স্নানের ঘরে ঢুকবে। এরপর অন্তত এক ঘণ্টার জন্য সারাপৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

শশীকান্ত ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছে উবু হয়ে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘর থেকে বেরোতে সে ভয় পাচ্ছে। জ্ঞানব্রতবাবু তাকে এঘরে থাকতে বলেছেন। এঘরের বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করা কি উচিত তার পক্ষে?

রতন কিছু জিজ্ঞেস না করেই এক কাপ চা রেখে গেছে তার সামনে। গরম গরম চা-টা শেষ করে ফেলল শশীকান্ত। এর আগে একবার সে বাথরুমটা দেখে এসেছে। বাথরুমে কমোড। শশীকান্ত জানে না ও জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। ওঃ কী ঝামেলার মধ্যে তাকে ফেললেন ওই জ্ঞানব্রতবাবু।

এর পরের বিপত্তিটা হল অন্যরকম।

উজ্জয়িনী কাল নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। ফিরেছে প্রায় রাত বারোটায়। সুতরাং সে শশীকান্তকে দেখেনি।

দশটা আন্দাজ ঘুম থেকে উঠেই উজ্জয়িনী গেল বাথরুমে। টুথব্রাশ হাতে নিয়ে দেখল, টুথপেস্ট নেই।

টুথপেস্ট কোম্পানির মালিকের বাড়িতেও কখনো টুথপেস্ট না থাকা বিচিত্র কিছু নয়। যে জিনিস ইচ্ছে করলেই বিনে পয়সায় শত শত পাওয়া যায়, সেই জিনিসের কথা মনেই থাকে না।

এমনও হয়েছে, সকাল বেলা বাথরুমে টুথপেস্ট না পেয়ে রতনকে পাঠিয়ে দোকান থেকে টুথপেস্টের নতুন টিউব কিনে আনতে হয়েছে। রতন অতশত বোঝে না। সে এনেছে অন্য কোম্পানির টুথপেস্ট। তখন সেটা ফেরত পাঠানো হল। কিন্তু পাড়ার দোকানে গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট নেই। ফলে বাধ্য হয়েই অন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করতে হত।

জ্ঞানব্রত দৈবাৎ নিজের বাড়িতে সেই অন্য কোম্পানির টুথপেস্টের টিউব দেখে ফেলেছিলেন। তিনি ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেননি।

বাথরুমের বন্ধ দরজার আড়াল থেকে দু-বার চেঁচিয়ে ডাকল, মা, মা।

কিন্তু সুজাতা নিজেই এখন বাথরুমে বন্দি। সে এখন মেয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না।

উজ্জয়িনীর স্বভাব অত্যন্ত ছটফটে। কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই। সব জিনিস তার এক্ষুনি চাই।

তার মনে পড়ল। গেস্ট রুমের সঙ্গের বাথরুমে এক সেট জিনিস সবসময় রাখা থাকে। ওখান থেকে টুথপেষ্ট ধার করা যায়।

হাতে ব্রাশটা নিয়ে রাত-পোশাক পরা অবস্থাতেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনী ছুটে গেল গেস্ট রুমে।

মায়ের কাছ থেকে এইটুকু অন্তত শিক্ষা পেয়েছে উজ্জয়িনী যে সে হঠাৎ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে না, সহজে ভয়ও পায় না।

বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ লুঙিপরা, খালি গায়ের একজন কালো লম্বা লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আড়ষ্টভাবে থমকে গেল উজ্জয়িনী।

বাঘকে বশ করবার জন্য যেমন তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকতে হয়, সেইরকমভাবে চেয়ে উজ্জয়িনী জিজ্ঞেস করল, তুমি–তুমি কে?

তার চেয়েও বেশি আড়ষ্টভাবে শশীকান্ত বলল, আজ্ঞে, আমার নাম শশীকান্ত দাস–

তুমি এখানে কী করছ?

আজ্ঞে, জ্ঞানব্রতবাবু আমাকে এখানে থাকতে বলেছেন।

এখানে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি নিজে কাল রাতে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন...আমি নিজে থেকে আসতে চাইনি, তিনিই জোর করে বললেন।

উজ্জয়িনী শশীকান্তর আপাদমস্তক আর একবার দেখল! কিছুতেই এর কথা বিশ্বাস করা যায় না। তার বাবা এইরকম একটা লোককে...রতন রতন বলে ডাকতে ডাকতে উজ্জয়িনী বেরিয়ে গেল সে-ঘর থেকে। তারপর রতনের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

সারাদিন ধরে শশীকান্তর সঙ্গে কথা বলার জন্য কেউ এল না। উজ্জয়িনী চলে গেল কলেজে। একটু পরে সুজাতাও চলে গেল মহিলা সমিতির এক মিটিং-এ। সুজাতার খাওয়া দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। এক- একদিন দুপুরে কিছু খাওয়াই হয় না। শরীর থেকে অন্তত দশ পাউণ্ড ওজন খসিয়ে ফেলতে সে বদ্ধপরিকর।

রতন দুপুরের খাবার দিয়ে গেল শশীকান্তর ঘরেই।

চীনে মাটির প্লেটে ভাত, তারই মধ্যে ডাল, আলু ভাজা। আর একটি বাটিতে মাংস।

ওইটুকুনি ভাত, শশীকান্ত তিন গেরাসে খেয়ে নিতে পারে। বস্তুত ভাত ছাড়া তার আর কোনো প্রিয় খাদ্য নেই। শুধু একটু ডাল পেলেই সে পুরো এক সের চালের ভাত খেয়ে ফেলতে পারে।

সেই ভাতটুকু শেষ করে শশীকান্ত থালা চাটতে লাগল। রতনের আর পাত্তা নেই।

মেসবাড়ির ঠাকুরও জিজ্ঞেস করে আর ভাত লাগবে? আর এবাড়ির কেউ তা জিজ্ঞেস করল না? এ কীরকম বাড়ি! গতকাল রাতে জ্ঞানব্রত নিজের সঙ্গেই শশীকান্তকে নিয়ে বসেছিলেন খাবার টেবিলে। রাতে ছিল রুটি। শশীকান্ত রুটি পছন্দ করে না। তা ছাড়া

প্রথম দিন সে লজ্জায় বেশি খায়নি। কিন্তু প্রত্যেক দিন এ-রকম সিকি-পেটে খেয়ে থাকতে হলেই হয়েছে আর কী! তাহলে কাজ নেই তার নরম গদির বিছানায়।

৩. শশীকান্ত চুপচাপ শুয়ে রইল

সারাদিন শশীকান্ত চুপচাপ শুয়ে রইল সেই ঘরে।

রাতে অনেকটা সাহসসঞ্চয় করে ফেলল সে।

রতন খাবার নিয়ে আসতেই সে বলে উঠল, আমি রুটি খাই না। ভাত নেই?

রতন বলল, এবাড়িতে রাত্রিতে ভাত হয় না।

শশীকান্ত তাতেও দমে না গিয়ে বলল, বেশ। কিন্তু ও কয়খানি রুটিতে আমার পেট ভরবে না। আরও রুটি লাগবে।

খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখে রতন ফিরে গেল। ফিরে এল আরও প্রায় দশ-বারোখানা রুটি নিয়ে।

ব্যাঙ্গের সুরে সে জিজ্ঞেস করল, এতে হবে?

শশীকান্ত ঘাড় নাড়ল।

তারপর মুখ তুলে, খাতিরকরা গলায় জিজ্ঞেস করল–দাদার নাম কী?

খুবই অবজ্ঞার সুরে সে বলল, রতনকুমার দাস।

উৎসাহিত হয়ে শশীকান্ত বলল, আপনিও দাস। আমিও দাস। আমার নাম শশীকান্ত দাস। কুষ্টিয়ায় বাড়ি।

এতেও বরফ গলল না। আর কোনো উত্তর না দিয়ে রতন চলে গেল। যেন সে বুঝিয়ে দিতে চায়, তার দাস আর শশীকান্তর দাস এক নয়। বাংলাদেশের লোক। তাই ধরনধারণ এরকম।

প্রায় এইরকম ভাবেই সাতটা দিন কাটল।

নির্জনতায় অতিষ্ঠ হয়ে সপ্ততম রাত্রিতে মরিয়া হয়ে গিয়ে শশীকান্ত ধরল গান। বেশ উঁচু গলায়। সেই গানটা, শহরে ষোলোজন বোম্বেটে

তখন উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে ইংরেজি বাজনা!

অষ্টম দিন দুপুরে দমদম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছোলেন জ্ঞানব্রত।

আগে থেকে খবর দেওয়া আছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে। সঙ্গে একটা ছোটো ব্যাগ ছাড়া মালপত্রের ঝঞ্ঝাট নেই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত বেরিয়ে আসছেন বাইরে, হঠাৎ একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে কোথা থেকে তাঁর পথ আটকে দাঁড়াল।

এক গাল হেসে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আমায় চিনতে পারছেন?

মুখে একটানা ভ্রমণের ক্লান্তি, হাতে একটা ভারী ব্রিফকেস, জ্ঞানব্রত চাইছিলেন কোনোক্রমে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে গলার টাই ও জামার বোতাম খুলে ফেলতে।

সামনে মেয়েটিকে দেখে তাকে থমকে দাঁড়াতেই হল।

মেয়েটি সারামুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে বলল, নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছেন? আমি কে বলুন তো?

এই কয়েকটা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষজনের মধ্যে থাকতে হয়েছে। জ্ঞানব্রত বাংলাতে কথা বলারও কোনো সুযোগ পাননি। হঠাৎ কলকাতার পা দেবার পরমুহূর্তেই কেউ এ-রকম পরীক্ষায় ফেললে তিনি পারবেন কেন।

মেয়েটিকে চেনা লাগছে ঠিকই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। মেয়েটি বেশ রূপসী, সঙ্গে কেউ নেই, এয়ারপোর্টে একা, তবে কি কোনো এয়ার হোস্টেস?

কিন্তু এয়ার হোস্টেসদের পোশাকের মধ্যে কীরকম যেন নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার থাকে সেটা দেখলে বোঝা যায়। এর পোশাক সেরকম নয়। বেশ একটা চড়া লাল রঙের শাড়ি পরে আছে।

মেয়েটি জ্ঞানব্রতর চোখে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করছে বলে তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনতে পারব না কেন?

আমার নাম বলুন তো?

নামটা তো মনে নেই বটেই, এমনকী কোথায় যে দেখেছেন মেয়েটিকে, তাও মনে করতে পারছেন না জ্ঞানব্রত।

এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? এই তো মাত্র দশ-বারো দিন আগে দেখা হয়েছিল।

কোথায়?

ক্যালকাটা ক্লাবে। আপনার এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন, কতক্ষণ আপনার টেবিলে বসলাম।

এলা?

যাক, চিনতে পেরেছেন তাহলে।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, কেন মেয়েটিকে তিনি ঠিক গেস করতে পারছিলেন না। এ রকম একটি সুশ্রী মেয়েকে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখে তাঁর ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

কিন্তু সে-দিন মেয়েটি জিন খেয়ে নেশা করেছিল বলে তার চোখ দু-টি ছিল কাচের মতন। আর প্রায় সর্বক্ষণই দেখেছিলেন বসে থাকা অবস্থায়। আজ একে দেখছেন একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। বিভিন্নরকম চুল বাঁধবার কায়দাতে মেয়েদের মুখ অনেকখানি বদলে যায়।

জানেন, আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক?

বিমানযাত্রীদের কাছে এ সংবাদ বেশ একটা বড়ো সমস্যা বটে, কিন্তু জ্ঞানব্রতের মনে কোনো দাগ কাটল না। কলকাতা শহরে তাঁর ট্যাক্সি চড়ার কোনো অবকাশ হয় না। তাঁর জন্য নিশ্চয়ই গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে।

তুমি কোথাও যাচ্ছ, না আসছ?

এলা আবার হেসে ফেলল। তারপর ছেলেমানুষদের মতন দুষ্টুমির সুরে বলল, আমি কোথাও যাচ্ছিও না, আসছিও না।

জ্ঞানব্রত ব্রিফকেসটা ডান হাত থেকে বাঁ-হাতে নিলেন।

আমি একজনকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।

ও।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো হল। চলুন একটু কফি খাবেন? সেদিন আপনি আমাকে অনেক খাইয়ে ছিলেন, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব।

একটু ইতস্তত করে জ্ঞানব্রত বললেন, ঠিক কফি খাবার ইচ্ছে এখন আমার নেই, বাড়ি ফেরার একটু তাড়া আছে, ওটা না হয় আর একদিন হবে।

আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই? আমি কিন্তু লিফট নেব।

খুব ভালো কথা।

আসবার সময় কী কান্ড! আমার এক দিদি আজ আগরতলায় গেল। সঙ্গে অনেক মালপত্র, এদিকে ট্যাক্সি বন্ধ...শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে একটা শেয়ারের গাড়িতে...

টার্মিনালের বাইরে এসে জ্ঞানব্রত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এক জায়গায়। গাড়ি তাঁকে খুঁজতে হবে না। গাড়ির ড্রাইভারই তাঁকে খুঁজে বের করবে।

কোথায় আপনার গাড়ি? কত নম্বর?

ব্যস্ত হবার কিছু নেই, গাড়ি আসবে এখানে।

জানেন, আপনি আমার একটা দারুণ উপকার করেছেন?

জ্ঞানব্রত রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন, আমি! আমি আপনার কী উপকার করেছি? মাত্র একদিন দেখা।

চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে বলছি।

ঠিক এই সময় একজন কেউ ডাকলেন, জ্ঞানদা! জ্ঞানদা!

জ্ঞানব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখলেন বাবুল আমেদ হন্তদন্ত হয়ে আসছে এই দিকে। দু-হাতে দু টি সুটকেস।

বাবুল আমেদ মোটাসোটা, হাসিখুশি মানুষ। কার্ডবোর্ড বক্সের বেশ বড়ো ব্যবসা আছে। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট। জ্ঞানব্রতর চেয়ে দু-তিন বছর বড়োই হবেন, কিন্তু ইনি প্রায় সবাইকেই দাদা বলে ডাকেন।

আরে দাদা, কী ঝামেলায় পড়েছি। আমার ফেরার কথা ছিল গতকাল। সে ফ্লাইট মিস করেছি, তারপর আর খবরও দিতে পারিনি, সেইজন্য আমার গাড়ি আসেনি। এদিকে আবার ট্যাক্সি স্ট্রাইক। আপনার কী অবস্থা?

জ্ঞানব্রত বললেন, চলুন, আপনাকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

এলার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া পড়ল। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সে পছন্দ করছে না।

জ্ঞানব্রতর কোম্পানির গাড়ি তখনই চলে এল সামনে। ড্রাইভার নেমে সেলাম করতেই জ্ঞানব্রত বললেন, পেছনের হুড খুলে দাও, এই সাহেবের সুটকেস যাবে।

এলা বলল, আমি সামনে বসি।

বাবুল আমেদ বললেন, না, না, আপনি সামনে বসবেন কেন? আমি বসব। আমার সামনে বসাই অভ্যেস।

গাড়ি চলতে শুরু করার পরই বাবুল আমেদ ব্যবসাপত্রের কথা শুরু করে দিলেন। দাদা, আপনি স্টেট ট্রেডিং-এর মালহোত্রাকে চেনেন; এবার দিল্লিতে গিয়ে দেখলাম!...

জ্ঞানব্রত হুঁ-হুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বাবুল আমেদ বললেন, রোককে। ড্রাইভার সাহেব, এখানে একটু রুখে দিন তো।

কী হল?

এই সামনের দোকান থেকে একটু কোল্ড ড্রিংকস নেব। অনেকক্ষণ ধরে তেষ্টা পেয়েছে। হঠাৎ কীরকম গরমটা পড়ে গেল দেখলেন?

গাড়ি থামতে পাশের দোকানে চার বোতল কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিলেন বাবুল আমেদ, অর্থাৎ ড্রাইভারের জন্যও একটা। পেছনের সিটে দু-টি বোতল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি জ্ঞানব্রতকে বললেন, দাদা এ আপনার মেয়ে তো? এতক্ষণ চিনতেই পারিনি, সেই অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলাম, ফ্রক পরার বয়েস তখন

এ-রকম ভুল করার জন্য বাবুল আমেদকে দোষ দেওয়া যায় না।

এলা তো জ্ঞানব্রতর মেয়েরই প্রায় সমবয়েসি। তা ছাড়া অনাত্মীয়া যুবতী মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে ঘোরার সুনাম জ্ঞানব্রতর নেই ব্যবসায়ী-মহলে।

এলা মুখটা ফিরিয়ে থাকে।

জ্ঞানব্রত একটু বিব্রতভাবে বললেন, না, না, আমার মেয়ে না। মেয়ের বান্ধবী, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা হল।

জ্ঞানব্রতকে সামান্য মিথ্যে কথা বলতে হল। এলা তাঁর মেয়ের সঙ্গে এক বছর এক কলেজে পড়েছে বটে, কিন্তু তার মেয়ের বান্ধবী নয়। উজ্জয়িনী এলার নাম শুনে ভালো করে চিনতেই পারেনি। বয়েসের তুলনায় এলা অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করার পর বাবুল আমেদ আবার ফিরে গেলেন ব্যবসার কথাবার্তায়। এলা কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না।

বাবুল আমেদ নামলেন মৌলালীতে।

তারপর এলা গম্ভীরভাবে বলল, আমাকে এসপ্ল্যানেডে ছেড়ে দিলেই হবে।

তোমার বাড়ি কোথায়?

অনেক দূরে, বেহালার কাছে।

বেহালা অনেক দূরে তো বটেই তা ছাড়া একেবারে অন্য রাস্তায়।

জ্ঞানব্রত অতিশয় ভদ্র, মাঝপথে কোনো মহিলাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি পৌঁছে পোশাক বদলাবার জন্য তাঁর মনটা ছটফট করছে।

এখন রাত সাড়ে নটা। একবার তিনি ভাবলেন, তিনি আগে বাড়ি গিয়ে তারপর ড্রাইভারকে বলবেন, বেহালায় এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে। তাঁর বাড়ির সামনে গাড়িতে এলা বসে থাকবে...।

জ্ঞানব্রতকে দ্বিধা করতে দেখে এলা বলল, আমাকে এই সামনে এসপ্লানেডে নামিয়ে দেবেন, আমার কোনো অসুবিধে নেই আপনার সঙ্গে দেখা না হলে তো আমি মিনি বাসেই ফিরতাম।

জ্ঞানব্রত জোর দিয়ে বললেন, না, সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি তোমার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসব। কতক্ষণ আর লাগবে।

আমার বাড়ি পর্যন্ত গেলে আপনাকে একবার নামতে হবে। কথা দিন।

এখন, এত রাত্রে?

ক-টা আর বাজে?

অন্তত দশটা বেজে যাবে।

তাতে আর কী হয়েছে। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন শুধু।

আমি সন্ধ্যের পর চা-কফি আর কিছু খাই না।

এবার গলা নীচু করে, মুচকি হেসে এলা বলল, হুইস্কি অবশ্য খাওয়াতে পারব না বাড়িতে।

জ্ঞানব্রত নিয়মিত মদ্যপান করেন না। কখনো কখনো একটু একটু। এ মেয়েটি কি তাঁকে নেশাখোর ভেবেছে নাকি? পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে যাবার পর ক-জন লোকই-বা রাত দশটার সময় চা খায়?

এসপ্ল্যানেড আসবার পর জ্ঞানব্রত ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন বেহালার দিকে যাওয়ার জন্য। তারপর তিনি অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গেলেন।

আপনি আমার ওপর রেগে গেলেন?

আরে? রাগ করব কেন?

কোনো কথা বলছেন না আমার সঙ্গে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এ মেয়েটা কি পাগল নাকি? হঠাৎ তিনি রাগ করতে যাবেন কেন ওর ওপরে? তা ছাড়া কোনো কিছু বলবার না থাকলেও কথা বলে যেতে হবে? এমনিতেই কম কথা বলা তাঁর স্বভাব।

আপনার কৌতূহল খুব কম, তাই না?

কেন? সেটা কী করে বোঝা গেল।

আপনি আমায় এয়ারপোর্টে দেখেও প্রথমে জিজ্ঞেস করেননি কার সঙ্গে সেখানে গেছি। তারপর এই যে আপনাকে বললাম, একবার আমার বাড়িতে নামতে হবে, তখনও জিজ্ঞেস করলেন না, বাড়িতে কে কে আছে?

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, এবার মেয়েটি ঠিকই ধরেছে। এটা বোধ হয় সুজাতার প্রভাব। সুজাতা কখনো কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে না। নারী জাতির মধ্যে সুজাতার মতন এমন কম কৌতূহলপরায়ণা খুবই দুর্লভ।

তিনি হেসে বললেন, একটা ব্যাপারে অবশ্য আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে, তুমি তখন বললে, আমি তোমার উপকার করেছি সেটা কী উপকার?

আপনি রেডিয়োর স্টেশন ডিরেক্টার পিসি বড়ুয়ার সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলেন, মনে আছে?

হুঁ।

উনি আমায় গানের প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন। আগে আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পাইনি। এবার যে পেলাম সে তো আপনার জন্যই।

এজন্য আমি তো কোনো চেষ্টা করিনি। যাই হোক। যদি তোমার উপকার হয়ে থাকে, আর তাতে আমার কোনো যোগাযোগ থাকে, তাতে আমার খুশি হবারই কথা।

সামনের মাসেই আমার প্রোগ্রাম।

বা:!

আপনারা বেশ মেকানিক্যাল। যখন-তখন বাঃ বলতে পারেন। এলার গলায় রাগের ঝাঁঝের পরিচয় পেয়ে জ্ঞানব্রত একটু সচকিত হলেন। তিনি কোনো ভুল করে ফেলেছেন?

এখানে, বা:! বলা বেমানান?

নিশ্চয়ই বেমানান। আমি কেন গান করি, সে-সম্পর্কে আপনার একটু কৌতূহল নেই, তবুও বললেন বা:।

রেডিয়োতে প্রত্যেকদিন কত ছেলে-মেয়েই তো গান গায়। তা ছাড়া জ্ঞানব্রত অতি কদাচিত রেডিয়ো শোনেন। সুতরাং রেডিয়োতে কে, কবে, কী গান গাইবে, সে-ব্যাপারে জ্ঞানব্রতর কৌতূহল বা আগ্রহ থাকবে কেন? কিন্তু যে জীবনে প্রথম রেডিয়োতে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছে, তার কাছে এটা নিশ্চয়ই খুবই উত্তেজনার ব্যাপার।

না। না। শুনতে হবে। একদিন শুনব তোমার গান।

দেখি, সে দিনটা কবে আসে।

খুব শিগগিরই একদিন..

একটা মুশকিল হয়েছে কী জানেন, আমি নজরুল-অতুলপ্রসাদ গাই, কিন্তু বড়সাহেব বললেন, পল্লিগীতিতে স্কোপ বেশি। ওই প্রোগ্রামে ভালো আর্টিস্ট পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমায় একটা করে পল্লিগীতির অনুষ্ঠানও করে যেতে হবে। আমি ফোক সঙ কোনোদিন তেমন শিখিনি... এখন শিখতে যেতে হবে কারুর কাছে।

এতক্ষণে শশীকান্তর কথা মনে পড়ল জ্ঞানব্রতর। তিনি একজন গায়ককে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। সে ছেলেটা কী করছে কে জানে? সে কি সুজাতা-উজ্জয়িনীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে?

আমি একজন পল্লিগীতির গায়ককে চিনি। ভালো গায়। জানি না, সে তোমার শেখাতে পারবে কিনা।

কে? কে? কী নাম?

একদিন আলাপ করিয়ে দেব তোমার সঙ্গে।

এলা তার ডান হাতটা সিটের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে জ্ঞানব্রতর একটা হাতের ওপর রাখল। জ্ঞানব্রত প্রায় শিহরিত হলেন। এ কী করছে মেয়েটা? সামনে ড্রাইভার রয়েছে। এরকমভাবে তো প্রেমিক-প্রেমিকারা হাতের ওপর হাত রাখে। মেয়েটা তাঁর সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করছে কেন?

জ্ঞানব্রত নিজের হাতটা সরিয়ে নিতেও পারলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আড়ষ্টভাবে বসে রইলেন।

বেহালায় বাড়ির সামনে পৌঁছে এলা আর বিশেষ জোর করল না। জ্ঞানব্রত দু-বার না বলতেই সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। আজ নামতে হবে না। কিন্তু বাড়ি তো চিনে গেলেন, অন্য কোনোদিন আসবেন তো?

-হ্যাঁ, আসব। গান শোনা আর চা পাওনা রইল।

অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে জ্ঞানব্রতর দিকে হেসে এলা খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি জানি, আপনি ঠিক আসবেন।

বাড়ি ফেরার পর সুজাতা জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হল? প্লেন লেট ছিল?

না, আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক। দু-জনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

ভালো করে স্নান করে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরার পর জ্ঞানব্রত খুব স্বস্তির সঙ্গে বললেন, আঃ।

আজ তাঁর ভালো ঘুম হবে। নিজের বাড়িতে, নিজের বালিশটিতে মাথা দিয়ে ঘুমোনোর মতন আরাম আর নেই।

খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িটা বড় চুপচাপ লাগছে। খুকু কোথায়?

ও নাইট শো-তে সিনেমায় গেছে। বুলুমাসিদের সঙ্গে। আর একটু বাদেই ফিরবে।

তুমি গেলে না সিনেমায়?

আমি কি সব সিনেমা দেখি? তা ছাড়া তুমি আজ আসবে।

সেই ছেলেটি কোথায়? সে খেয়েছে?

সুজাতা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে টেবিলের ওপর দু-হাত রেখে মুখখানা নীচু করে রইল।

উত্তর না পেয়ে বিস্মিত হলেন জ্ঞানব্রত। চেয়ারে না বসে তিনি এগিয়ে গেলেন গেস্ট রুমের দিকে।

সে-ঘরটির দরজাটা বন্ধ। জ্ঞানব্রত একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঘর ফাঁকা।

এ কী? সেই ছেলেটি কোথায়? শশীকান্ত? সুজাতা খুব ধীর স্বরে বলল, সে আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। সারাদিনে আর ফেরেনি।

স্ত্রীকে দু-একটি প্রশ্ন করেই থেমে গেলেন জ্ঞানব্রত।

বাড়িতে তিনি একজন অতিথি রেখে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েক দিন কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখলেন সেই অতিথি নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় অতিথির প্রতি অযত্ন, অবহেলা, অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছিল নিশ্চয়।

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ এমনকী উঁচুগলায় কথা বলাও জ্ঞানব্রতর স্বভাব নয়। তাঁর সব কিছুই মনে মনে।

শশীকান্ত কোথায় যেতে পারে? তার তো কোনো যাবার জায়গা নেই। সে মেস ছেড়ে চলে এসেছে, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেখানে একজন রুমমেট তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত ছিল। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? যোধপুর পার্কে বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত, অনেকেই বলে। পুলিশে ফোন করা কি উচিত হবে? শশীকান্ত একজন শক্তসমর্থ চেহারার পুরুষ-মানুষ, সে বাড়ি ফেরেনি বলে থানায় খবর দিলে যদি সেখানকার লোকেরা হাসাহাসি করে?

পোশাক বদলে জ্ঞানব্রত দু-টি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়লেন। সুজাতা বাথরুমে। উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারে একটা উগ্র বিদেশি সুর বাজছে। জ্ঞানব্রত একদিন দেখেছিলেন, উজ্জয়িনী ঘরের মধ্যে একা একাই নাচে। তখন বড় সুন্দর দেখায় ওকে, চোখ দুটো মোহের আবেশে বুজে আসা, হাতের আঙুলগুলো যেন মোমে গড়া। ঠোঁটের

ভঙ্গিতে অদ্ভুত সারল্য। কিছু দিন ধরে মেয়ের কথা ভাবলেই এলার কথা মনে পড়ে। ওরা প্রায় একই বয়সি। কিন্তু দু-জনে কত আলাদা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাত-পোশাক পরা সুজাতা নিজের খাটে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল। কিন্তু আজ আর ডিটেকটিভ উপন্যাস খুলল না।

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ?

জ্ঞানব্রত চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। চক্ষু বোজা। বুকের উপর আড়াআড়ি দুটি হাত রাখা। আজ আর ঘুমের আরাধনা করতে হবে না, ট্যাবলেট তার কাজ ঠিক সময়মতন করবেই। এর সঙ্গেই হাত-পা একটু ঝিমঝিম করছে।

না, তুমি কিছু বলবে?

আমাদের যে এক সঙ্গে বাইরে কোথাও যাবার কথা বলেছিলে? যাবে না?

হ্যাঁ। যাওয়া যেতে পারে। কোথায় যাবে, ঠিক করেছ?

পুরী।

পুরী গত বছরই তো গিয়েছিলুম।

গতবার তো সারাক্ষণই বৃষ্টি হল..সমুদ্র আমার ভালো লাগে..

ঠিক আছে। কালই হোটেল বুক করবার ব্যবস্থা করব। নিজের খাট থেকে উঠে এসে সুজাতা বলল, একটু সরো তোমার পাশে আমি শোব।

আজ বই পড়বে না?

কেন, তোমার পাশে শুলে আপত্তি আছে?

জ্ঞানব্রত হাত বাড়িয়ে সুজাতার কোমর ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। মনে মনে অনুশোচনা হল। কেন ঘুমের ট্যাবলেট খেতে গেলেন আজ। আসল ব্যাপারটা হবার আগে সুজাতা অনেকক্ষণ আদর পছন্দ করে। যদি তার মধ্যে ঘুম এসে যায়!

জ্ঞানব্রতর মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার উপরে রাগ করেছ?

কেন, রাগ করব কেন?

..ওই যে গায়কটি, শশীকান্ত...ও বাড়ি ফেরেনি, তুমি ভাবছ ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি...

...না, না, সে-কথা বলব কেন?

... লোকটি তো কথাই বলতে চায় না, এত লাজুক, আমি দু-এক বার চেষ্টা করেছি..তুমি শখ করে ওকে বাড়িতে ডেকে এনেছ, ওর যাতে কোনো অযত্ন না হয় সে-কথা আমি কাজের লোকেদের বলেছিলাম।

না, না, তুমি তো যথেষ্ট করবেই, আমি জানি।

তোমার শরীর কি ভালো নেই, কিছুদিন ধরেই দেখছি, তুমি অন্যমনস্ক?

শরীর তো ঠিকই আছে। অন্যমনস্ক থাকি বুঝি?

তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করছ আজকাল।

সুজাতার ঊরু কি মসৃণ, তলপেটে ভাঁজ পড়েনি, বুক দু-টি এখনও সুগোল। বোঝাই যায় না, তার অত বড়ো মেয়ে আছে। আজ জ্ঞানব্রতকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি এখনও সক্ষম পুরুষ-মানুষ। কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না।

মধ্যপথে বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল! বেডরুমের টেলিফোনের কানেকশন রাত এগারোটার পর অফ করা থাকে। সুজাতা নিজেই এটা করে। আজ সে ভুলে গেছে। আজই। বেশি রাতের টেলিফোনের আওয়াজে কেমন একটা গা ছম ছম করা ভয় আছে। জ্ঞানব্রতর নির্দেশ আছে অফিসের হাজার জরুরি কাজ থাকলেও কেউ যেন তাঁকে রাত এগারোটার পর বিরক্ত না করে। কিন্তু যদি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে?

স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই একটুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুনল আওয়াজটা। তারপর সুজাতা বলল, আমি ধরব? জ্ঞানব্রত বললেন, না, আমি ধরছি।

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। জড়িত গলায় কে যেন হিন্দিতে কী জানতে চাইছে।

জ্ঞানব্রত কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো, হু ইজ স্পিকিং? হুম ডু য়ু ওয়ান্ট?

রং নাম্বার।

জ্ঞানব্রতর ইচ্ছে হল টেলিফোন যন্ত্রটা আছড়ে ভেঙে ফেলতে। তার বদলে তিনি তার ধরে এক টান দিয়ে প্লাগটা খুলে ফেললেন। সুজাতা ততক্ষণে উঠে বসেছে। জ্ঞানব্রত ফিরে আসতেই বলল, আজ আর থাক।

জ্ঞানব্রত আপত্তি করলেন না। তিনি জানেন, একটু কোনোরকম ব্যাঘাত ঘটলেই সুজাতার মুড অফ হয়ে যায়।

এরপর শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন জ্ঞানব্রত। যেন ট্যাবলেটের ঘুম তাঁর জন্য জানলার বাইরে অপেক্ষা করছিল।

পরদিন সকাল বেলা জানা গেল শশীকান্ত বাড়ির গেটের বাইরের সিঁড়িতে বসে ঘুমোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত নিজেই যথেষ্ট ভোরে ওঠেন কিন্তু তাঁর আগেই রঘু দেখতে পেয়েছে। খবর পেয়ে জ্ঞানব্রত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই শশীকান্ত ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ কচলাতে লাগল।

কী ব্যাপার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে?

আমি হারাই নাই স্যার, আমারে যারা পৌঁছাতে এসেছিল...

তারা কারা?

ব্যাণ্ডেলে গেছিলাম স্যার, একটা ফাংশান ছিল। আসরে গাইতে দিল রাত এগারোটার পর। দুইখানা গানের পর পাবলিক বলল, আরও চাই-আরও চাই। গাইলাম আরও তিনখানা।

বাঃ। ভালো কথা। ব্যাণ্ডেলে ফাংশান করতে গিয়েছিলে সেকথা এবাড়িতে কাউকে বলে যাওনি কেন?

দুপুরে রেডিয়ো স্টেশনে গেলাম। সেখানে বিমানদা বললেন, ব্যাণ্ডেলে একটা ফাংশান আছে, যাবে? মুম্বাইয়ের একজন আর্টিস্ট আসে নাই। ওরা সেইজন্য তিন-চারজন একস্ট্রা লোকাল আর্টিষ্ট চেয়েছে। যাবে তো এক্ষুনি চলো, এক-শো টাকা পাবে। স্যার, এক-শো টাকা রেট তো আমারে আগে কেউ দেয় নাই, তাই রাজি হয়ে গেলাম। পাবলিক খুব সাপোর্ট দিচ্ছে স্যার, আমারে থামতেই দেয় না। ওই গানটা গাইলাম, ষোলো জন বোম্বেটে...

ঠিক আছে। বাড়ির ভেতরে এসো, হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

আপনি রাগ করেছেন, স্যার?

না। আমাকে স্যার বলে ডেকো না।

কী বলব?

ইয়ে, শুধু দাদা বলতে পার।

এরপর শশীকান্তের জন্য অন্য ব্যবস্থা হল। দো-তলার সুসজ্জিত গেস্টরুমটির বদলে তাকে পাঠানো হল এক-তলার সাদামাটা একটি ঘরে। সেখানে সে বেশি স্বস্তি পাবে। ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে। ইচ্ছে করলে সেখানে সে তার গানের রেওয়াজও করতে পারে। তাতে ওপর তলার লোকেদের কোনো ব্যাঘাত হবে না। তার খাবারও পাঠিয়ে দেওয়া হবে নীচে।

এসব সুজাতারই ব্যবস্থাপনা।

খাবার টেবিলে বসে জ্ঞানব্রত বললেন, তাহলে শনিবারেই পুরীর হোটেল বুক করছি। শচীনকে বলে দিচ্ছি, আজই টিকিট কেটে ফেলবে। ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্লেনে যাবে, না ট্রেনে?

সুজাতা বলল, ট্রেনেই ভালো। এক রাত্রিরই তো ব্যাপার। ওখানে গাড়ি পাওয়া যাবে তো?

হ্যাঁ, টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় ঘুম-চোখে উশকোখুশকো চুলে এসে হাজির হল উজ্জয়িনী। টেবিলে বসেই বলল, আমার দুধটা দিয়ে দাও আমি আজ তাড়াতাড়ি বেরোব।

সুজাতা বলল, খুশি, এই শনিবার আমরা পুরী যাচ্ছি।

উজ্জয়িনী যেন আকাশ থেকে পড়ল। সারামুখে বিস্ময় ছড়িয়ে বলল, পুরী? এখন? তোমাদের কী মাথা খারাপ?

কেন?

গত বছর মনে নেই? সর্বক্ষণ বৃষ্টি।

তা বলে কি এবারেও বৃষ্টি হবে?

নিশ্চয়ই হবে। দেখছ না, এখানে এরই মধ্যে দু-একদিন বৃষ্টি হয়ে গেল।

তা হোক না। বৃষ্টির মধ্যেও সমুদ্র দেখতে কত ভালো লাগে। ইচ্ছে হলে আমরা পুরীর বদলে কোনারকে গিয়েও থাকতে পারি।

তোমাদের ভালো লাগে তোমরা যাও।

তুমি যাবে না?

ইমপসিবল! আমি কলকাতা ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারব না।

কেন তোর এমনকী কাজকর্ম আছে শুনি!

এই শনিবার দিন পারমিতার জন্মদিনের পার্টি। আমরা অনেক মজা করব, কত দিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি।

ঠিক আছে, আমরা তা হলে শনিবারের বদলে রোববার যাব।

রোববার থেকে আমাদের নাটকের রিহার্সাল। আমরা মিড সামার নাইটস ড্রিম করছি।

তাহলে আমরা যাব, তুই যাবি না?

তোমরা কি আমায় জিজ্ঞেস করে যাওয়া ঠিক করেছ? আমার সুবিধে-অসুবিধে কিছু আছে কি না, তা একবারও ভেবে দেখবে না?

জ্ঞানব্রত চুপ করে আছেন। মেয়ে বড়ো হয়েছে, তার একটা নিজস্ব মতামত তো থাকবেই। বাবা-মা যখন যেখানে যেতে বলবে তাতে রাজি হবে কেন?

উজ্জয়িনীর ওপর জোর করেও কোনো লাভ নেই। দারুণ জেদি মেয়ে।

মা ও মেয়েতে আরও কিছুক্ষণ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলবার পর জ্ঞানব্রত বাধা দিয়ে বললেন, থাক ও যদি যেতে না চায়, ও থাক।

তা বলে বাড়িতে ও একা থাকবে?

উজ্জয়িনী এবার ফোঁস করে উঠে বললেন, হোয়াই ডু য়ু মিন একা? আমি কি একা থাকলে ভূতের ভয় পাব?

শেষপর্যন্ত ঠিক হল উজ্জয়িনী একাই থাকবে। পুরীতে যাবে শুধু স্বামী-স্ত্রী। জ্ঞানব্রতর ক্ষীণ আসা ছিল, যদি সুজাতা পুরো ব্যাপারটাই ক্যানসেল করে দেয়। কেন না, পুরীতে এখন বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে তাঁরও নেই। কিন্তু সুজাতা যাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অফিসে গিয়েই হোটেলের বুকিং এবং টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেললেন জ্ঞানব্রত। তারপর কাজে ডুবে গেলেন।

নিজে কিছুদিন তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন, আবার বাইরে যাচ্ছেন, মাঝখানে অনেকগুলো কাজ সেরে রাখতে হবে।

দু-দিন বাদে শেষ বিকেলে একটা টেলিফোন পেলেন জ্ঞানব্রত।

আমি এলা বলছি। নাম শুনে চিনতে পারছেন তো?

হ্যাঁ।

আপনি আজ খুব ব্যস্ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ব্যস্তই বলা যায়।

তা হলে আমি যাব না? আমার ইচ্ছে ছিল আপনার কাছে গিয়ে নেমন্তন্ন করার। টেলিফোনেই বলব?

মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞানব্রত চিন্তা করলেন, কীসের নেমন্তন্ন? বিয়ের? এরই মধ্যে মেয়েটি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে! আশ্চর্য!

হ্যাঁ বলুন, মানে, ইয়ে বলো...

কাল সন্ধেবেলা আপনি ফ্রি আছেন তো? না থাকলেও আপনাকে সময় করতেই হবে।

কী ব্যাপার?

আমার এখানে একটা ছোট্ট ঘরোয়া গান-বাজনার আসর কালকে। আপনার আসা চাই। আমি কিন্তু কোনোরকম আপত্তি শুনব না। আসতে হবেই।

জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা তার ভালো লাগছে না। এই মেয়েটি যেন তাকে ক্রমশই জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। সামান্য একটা ছোট্ট ঘরে থাকে মেয়েটি, সেখানে গান-বাজনার আসর? এই মেয়েটির সব কিছুই যেন অদ্ভুত।

আপনি কিছু বলছেন না যে, হ্যালো! হ্যালো!

আমার পক্ষে তো কাল যাওয়া সম্ভব নয়। একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

সন্ধ্যেবেলাতেও কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট? হি হি হি! কতক্ষণ লাগবে? আপনি একটু দেরি করে আসুন, কোনো অসুবিধাই নেই।

একটু নয়, অনেক দেরি হবে।

কতক্ষণ, ন-টা দশটা! তার পরেও অন্তত আসুন একটুক্ষণের জন্য!

দশটার পরেও একটি কুমারী মেয়ে তার বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করছে। জ্ঞানব্রত এসব জীবনে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

তিনি কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বললেন, না, আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। দুঃখিত।

আর কিছু শোনার আগেই তিনি রিসিভার রেখে দিলেন।

এই মেয়েটিকে আর একটুও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। একে একেবারে মুছে ফেলতে হবে মন থেকে।

কাজ শেষ করার পর যথারীতি বাড়ি ফিরে তিনি একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেন। আবার কি ব্লাড প্রেশার বেড়েছে? তাঁর এক বন্ধু তাঁর চিকিৎসক। তাঁর কাছে একবার যাবেন নাকি?

সারাদিন প্যাঁচপেঁচে গরম গেছে। বাথরুমে ঢুকতে গিয়েও তিনি ঘেমে গেলেন। ইচ্ছে করছে সাঁতার কাটতে। ডাক্তারও বলেছিলেন অবগাহন স্নানে ব্লাড প্রেশারের উপকার হয়।

গাড়ি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়ে চলে এলেন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে। একসময় এখানে তিনি নিয়মিতই আসতেন। হার্টের গন্ডগোলটার পর আর আসা হয় না।

আজ ইচ্ছে করছে দু-এক বোতল বিয়ার পান করতে। এই গরমে ভালো লাগবে। কিংবা অনেকখানি বরফ দিয়ে গিমলেট। কিন্তু জ্ঞানব্রত সে ইচ্ছেটা দমন করলেন। তাঁর এক বন্ধু বোম্বাইতে তিন পেগ জিন খেয়ে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। সুইমিং পুলের মধ্যেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়, চিকিৎসারও সুযোগ পায়নি।

নীল রঙের পরিষ্কার জল। তলার দিকটা বেশ ঠাণ্ডা। অন্য যারা সাঁতার কাটছে তারা প্রায় সবাই সাহেব-মেম। ভারতীয়রা এই ক্লাবের সভ্য হয় বটে। কিন্তু প্রায় কেউ জলে নামে না, জলের ধারে টেবিল নিয়ে বসে মদ খায় আর আড়চোখে অর্ধনগ্ন মেমদের দেখে।

আপন মনে সাঁতার কাটতে কাটতে জ্ঞানব্রতর হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সাঁতার শিখেছেন গ্রামের পুকুরে। কুষ্টিয়ার কুমারখালি গ্রামে। মামা বাড়িতে তাঁর সেজোমামা ন-বছরবয়স্ক জ্ঞানব্রতকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন পুকুরের মধ্যে। আঁকুপাঁকু করতে করতে ডুবে যাবার ঠিক আগে সেজোমামা এসে ধরে ফেলতেন। এইভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে যায়।

এসব মনে পড়েনি তো এতদিন! ক্যালকাটা ক্লাবের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে এসে এর আগে কোনোদিন তাঁর গ্রামের পুকুরের কথা মনে পড়েনি। শশীকান্তর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই...। কিন্তু এর মধ্যে একদিনও তো শশীকান্তর সঙ্গে গল্প করা হল না, কিংবা শোনা হল না তার গান।

খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে জ্ঞানব্রত ওপরে উঠে বসলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামবেন। জল খুব ভালো লাগছে আজ।

হঠাৎ পুলের ডান পাশের দিকে চোখ চলে গেল তাঁর, একজন নারীর বাহু ধরে এগিয়ে আসছে একজন দীর্ঘ চেহারার পুরুষ। রেডিয়োর সেই পি সি বড়ুয়া আর এলা। ওরা কোনো খালি টেবিল খুঁজছে।

জ্ঞানব্রত চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

সুইমিং পুলের রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উঠে এলেন জ্ঞানব্রত। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এলা কিংবা বড়ুয়া তাকে দেখতে পায়নি। জলের ধারে একটা টেবিলে বসে কী একটা কথায় যেন ওরা দু-জনেই হাসছে।

জ্ঞানব্রত চলে গেলেন পোশাক বদলাবার ঘরে। আগে গা-মাথা মুছলেন ভালো করে। তারপর দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। নিজের মুখটা এত অচেনা লাগছে কেন? কেন তিনি

একটু একটু কাঁপছেন? তাঁর ঈর্ষা হয়েছে? এই জিনিসটা তো তাঁর কোনোদিন ছিল না। এলাকে তো তিনি এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলেন।

পোশাক পরে নিয়ে বাইরে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তার এখন চলে যাওয়া উচিত। ওরা গল্প করছে করুক। এর মধ্যে তিনি নানান লোকের কাছে শুনেছেন যে, ওই বড়ুয়ার খুব মেয়ে বাতিক আছে। কোনো সুন্দরী মেয়ে পেলে ছাড়ে না।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু একটা প্রবল চুম্বক যেন তাঁকে টানছে পেছন থেকে। খুব ইচ্ছে করছে আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখতে তবু তিনি শক্তভাবে হাঁটতে লাগলেন। তার পিঠে কার ছোঁয়া লাগতেই তিনি চমকে উঠে বললেন, কে?

আপনি আমাদের দেখতে পেয়েও চলে যাচ্ছেন যে?

এলার মুখখানিতে কী চমৎকার সুস্বাস্থ্যের তাজা ভাব। কলঙ্কহীন মসৃণ, নিষ্পাপ মুখ। জ্ঞানব্রত যেন একটি বৃষ্টিভেজা সদ্য ফোটা ফুল দেখছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না।

আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এই মেয়েটি প্রায় তাঁর নিজের মেয়ের বয়সি। কিন্তু উজ্জয়িনীর তুলনায় কত বেশি অভিজ্ঞ। মুখখানা যত নিষ্পাপ দেখায় মোটেই তত নিষ্পাপ নয়। যার-তার সঙ্গে প্রকাশ্য জায়গায় মদ খেতে যায়। গায়িকা হিসেবে নাম কেনার জন্য পি সি বড়ুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পুরুষমানুষদের দিকে এমনভাবে তাকায় যাতে সরলতার সঙ্গে মিশে থাকে লাস্য। ক্যালকাটা ক্লাবে প্রথম আলাপের দিন জ্ঞানব্রতর দিকেও এলা এইভাবে তাকিয়েছিল।

অথবা, এসব দোষের নয়। জ্ঞানব্রত পুরোনোপন্থী? ব্যবসার জগতে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে, পৃথিবী কতটা বদলে গেছে, তা তিনি জানেন না?

অনেক কিছু বদলালেও ভালোবাসা, লোভ, দুঃখ, ঈর্ষা এসব বদলায় না। জ্ঞানব্রতর বুকের মধ্যে যে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব, সেটা ঈর্ষা ছাড়া আর কী।

তিনি ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর?

এলা বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে একটু বসবেন না?

আমি একটু সাঁতার কাটতে এসেছিলুম।

একটু বসুন। এক্ষুনি চলে যাবেন!

হ্যাঁ, যেতে হবে।

আপনি আমায় দেখলেই এড়িয়ে যেতে চান কেন বলুন তো?

ইয়ে...তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার কি কোনো কথা ছিল? সুতরাং এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে কী করে? চলি।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না, এবার বেশ গট গট করে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত। এলাকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরে তিনি বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন।

একটু আগে তাঁর মনে হচ্ছিল, এলা মেয়েটি তাকে ঠকিয়েছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে পি সি বড়ুয়ার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, সুইমিং ক্লাবে লাঞ্চ খেতে এসেছে। এবার তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এ-রকম কোনো মেয়ের সঙ্গে বাজে খরচ করার মতন সময় তাঁর নেই।

কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনের ভাব বদলে গেল আবার।

সুইমিং ক্লাবে প্রথমে বড়ুয়ার সঙ্গে এলাকে দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়েছিল, এটা অস্বীকার করতে পারেন না। তারপর এলা তাঁকে ডাকতে এলে তিনি ওদের সঙ্গে বসতে রাজি হননি। এতে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। তা হলে এখন আবার কষ্ট হচ্ছে কেন? অফিসে কোনো কাজে

মন বসছে না। একটু আগে একজন সাপ্লায়ার এসে কী বলে গেল তা তিনি ভালো করে শোনেনইনি।

এলাকে তিনি অপমান করেছেন। এ-রকম তো তাঁর স্বভাব নয়। কারুর সঙ্গেই তিনি রূঢ় ব্যবহার করেন না। বিশেষত একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে এ-রকম কেন হল?

সন্ধ্যের পর তার ড্রাইভার ছুটি চাইল। দেশ থেকে তার কোনো আত্মীয় আসবে। তাকে আনতে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর বাকি সন্ধ্যেটা ছুটি চায়।

অফিস থেকে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিলেন জ্ঞানব্রত। অনেকদিন পর তিনি নিজে আজ গাড়ি চালাবেন। বুকে ব্যথা হবার পর থেকে ডাক্তারের উপদেশে তিনি গাড়ি চালানো বন্ধ করেছিলেন।

এ কী, এ তিনি কোথায় যাচ্ছেন? নিজের ব্যবহারেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন জ্ঞানব্রত। মনের কোন গভীর জায়গায় এইসব ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে? এদিকে এলার বাড়ি। এলা একদিন খুব অনুরোধ করছিল তার বাড়িতে কিছুক্ষণ বসবার জন্য।

প্রথম আলাপে এলা বলেছিল, সে ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে থাকে। তারপর সে আলাদা ফ্ল্যাটের কথা উল্লেখ করেছিল। এলা তো চাকরি করে না। এসব খরচ সে চালায় কী করে? না, না, মেয়েটিকে কোনোক্রমেই নষ্ট হতে দেওয়া চলে না। তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনী যদি একটা সুন্দর সুস্থ জীবন পায় তা হলে এলাই-বা পাবে না কেন?

এলার ঘরে গানের আওয়াজ আসছে। যদি ওখানে বড়ুয়া বসে থাকে? বড়ুয়ার মতলব ভালো না, এলাকে সাবধান করে দিতে হবে। বড়ুয়াকেও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যেকোনো মেয়ের সঙ্গেই সে এরকম ব্যবহার করতে পারবে না।

দরজা খুলে এলা অবাক হয়ে গেল।

না, আর কেউ নেই, এলা একা একাই বসে গানের রেওয়াজ করছিল। এটা এলার দিদির ফ্ল্যাট। দিদি-জামাইবাবু বাইরে গেছেন বলে এলা কেয়ার টেকার।

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন অনেক কিছু বলবেন এলাকে। তিনি শুধু বললেন, এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলুম।

মোটেই না, শুধু ভাবছি আমার এত সৌভাগ্যের কারণটা কী?

তুমি গান গাইছিলে, তাই গাও, আমি শুনি।

আপনি একদিন কী একটা ফোক সঙ-এর কথা বলছিলেন আমি কিন্তু ফোক সঙ জানি না।

তুমি যা জানো, তাই গাও।

হারমোনিয়াম নিয়ে এলা নিঃসংকোচে গান ধরল। রবীন্দ্রসংগীত- মধুর তোমার শেষ যে পাই-।

এ গানটা জ্ঞানব্রত অনেকবার শুনেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, রবীন্দ্রসংগীত সব পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু এই গানটা তো আবার নতুন করে ভালো লাগল। এলার গলাটা সেরকম আহামরি কিছু না হলেও সুশ্রাব্য। চর্চা করলে ও একদিন নাম করতে পারবে।

বাঃ, বেশ ভালো হয়েছে।

আমি আপনার প্রশংসায় বিশ্বাস করি না। আপনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

না, না।

আমি ঠিক বুঝেছি। আপনি সেই ফোক সঙটার কথাই ভাবছিলেন নিশ্চয়ই। কী সেই গানটা?

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে করিয়ে পাগলপারা...। লালন ফকিরের গান।

এই গানটার বিশেষত্ব কী?

সেরকম কিছুই না। আমি যে গান-বাজনার খুব একটা ভক্ত, তাও না। তবু, রেডিয়োতে একদিন ওই গানটা শুনে আমি যেন কীরকম হয়ে গেলাম। আসলে আমার একটা হারিয়ে যাওয়া বাল্যকাল আছে। কয়েকটা বছরের কথা আমার কিছুই মনে পড়ে না। এই গানটা শুনে একটু একটু মনে পড়ল-কুষ্টিয়ায় থাকবার সময়ে একজন ফকিরের মুখে আমি এই গানটা শুনতাম...আমার দাদামশায়ের কাছে আসতেন সে-ফকির...। মনে হয় যেন একটু একটু করে সব মনে পড়বে এবার...। অবশ্য এত সব মনে পড়া ভালো নয়।

কেন ভালো নয়?

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ইদানীং, জীবনটা যদি আবার নতুন করে শুরু করা যেত।

এ-রকম চিন্তা আপনার মাথায় কে ঢোকালো? আপনি একজন সাকসেসফুল মানুষ, কোনোদিকেই অভাব নেই।

তবু তো মনে হয়।

আপনার বাড়িতে একজন গায়ককে এনে রেখেছেন, তাই না?

হ্যাঁ...তুমি কী করে জানলে?

এলা এবার চোখ টিপে দুষ্টু মেয়ের মতন হাসল। তারপর বলল, জানি... খবর রাখতে হয়...আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

আমার তো কোনো গোপন কথা নেই।

সেই গায়কের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন না। আমি তা হলে কয়েকটা ফোক সঙ শিখে নিতে পারি। আপনি যখন ওইসব গান এত ভালোবাসেন।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে জ্ঞানব্রত বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব। শোনো আমি সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি। তুমি আজেবাজে লোকেদের সঙ্গে ঘুরো না। তুমি মন দিয়ে গান শেখো। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমি যদি মাসে মাসে তোমাকে ধরো হাজার দেড়েক টাকা দিই, তাতে তোমার খরচ চলে যাবে?

অর্থাৎ আপনি আমাকে রক্ষিতা রাখতে চান?

কথাটা ঠিক একটা বুলেটের মতোই জ্ঞানব্রতর বুকে লাগল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

তুমি, তুমি আমাকে এইরকম কথা বললে।

আপনার কথার কি এ-রকম মানে হয় না? আপনি শুধু শুধু আমাকে প্রত্যেক মাসে অত টাকা দেবেন কেন?

মানুষ কি মানুষকে সাহায্য করে না?

এদেশে কি গরিব গায়কের অভাব আছে? আপনি আমায় সাহায্য করতে চাইছেন... আমি একটা মেয়ে বলেই তো? তা ছাড়া বউদি কী ভাববেন?

বউদি?

আপনার স্ত্রী...তিনি যদি জানতে পারেন যে আমার মতন এক মেয়েকে আপনি প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিচ্ছেন, তা হলে তিনি, ওই আমি যা বললুম, ঠিক সেই কথাই ভাববেন।

একটা বিমর্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্ঞানব্রত বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আমায় ক্ষমা করো।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই এলা তাঁর কাছে এসে বলল, আপনার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, আপনি মানুষটা খুবই ভালো। সত্যিকারের ভালো।

আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি।

যেন জ্ঞানব্রতই বয়সে অনেক ছোটো এইভাবে এলা গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, তা আমি ঠিকই বুঝেছি! আপনি মনে দুঃখ পেলেন নাকি?

জ্ঞানব্রত আর কিছু না বলে এলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আপনি যা ভাবছেন, আমার অবস্থা ততটা খারাপ নয়। আমার টাকাপয়সার কিছু ব্যবস্থা আছে। আমার বাবা রেখে গেছেন! তবে যে যেমন মনে করে, মেয়েদের একটা বয়স হলেই বিয়ে করে সংসার করা উচিত, সেইটাই সুখী জীবন, আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি গান-বাজনা নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে মিলব, ইচ্ছে না হলে মিলব না।

আমি যাই?

কেন? হঠাৎ উঠে পড়লেন যে।

জ্ঞানব্রতর একটা হাত নিয়ে এলা নিজের গালে ছুঁইয়ে বলল, বুঝেছি আমার ও কথাটার জন্য আপনি আঘাত পেয়েছেন। আমি কিন্তু মজা করে বলেছি।

মজা? কোনো মেয়ে নিজের সম্পর্কে এ-রকম একটা শব্দ প্রয়োগ করে মজা করতে পারে? জ্ঞানব্রতর সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

এরপর তিনি যা করলেন, সেরকম কিছু করবার কথা একটু আগেও তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

এলা এত কাছে, তার শরীরের উষ্ণতা, তার সান্নিধ্যের ঘ্রাণ যেন জ্ঞানব্রতকে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দিল। তিনি দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন এলাকে।

এলা একটুও আপত্তি করল না। পাখি যেমন তার বাসায় গিয়ে বসে সেইরকমভাবে এলা জ্ঞানব্রতর বুকে আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত রইল।

জ্ঞানব্রত যেন অন্য মানুষ। তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমায় একটু আদর করি?

এলা উঁচু করল তার মুখটা। জ্ঞানব্রত তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতেই এলা বার করল তার জিভ। অর্থাৎ চুম্বনটা যেন দায়সারা কিংবা সংক্ষিপ্ত না হয়।

সেই সময়টাতেও জ্ঞানব্রত ওকথা চিন্তা না করে পারলেন না যে তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীকেও এ-রকম একজন বয়স্ক লোক জড়িয়ে ধরে চুম খেতে পারে। উজ্জয়িনীও কি এলার মতন এত সব জানে! পি সি বড়ুয়াকে তিনি মনে মনে নিন্দে করেছিলেন, বড়ুয়া সুযোগসন্ধানী। কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই...। তিনিও কি নিরালায় সুযোগ নিয়ে এলাকে...

তক্ষুনি জ্ঞানব্রত নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছে।

এরপর দু-দিন মন থেকে সমস্ত অন্যরকম চিন্তা বাদ দিয়ে জ্ঞানব্রত শুধু কোম্পানির কাজে মেতে রইলেন। যেন তিনি নিজেকে শাস্তি দিতে চান।

কিন্তু তাঁর পুরী যাওয়া হল না।

তাঁর কারখানায় দুটি ইউনিয়ন। এর মধ্যে যে ইউনিয়নটি বেশি শক্তিশালী, তারা হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন ধর্মঘটের নোটিশ দিল। এ-সময় জ্ঞানব্রতর বাইরে যাওয়া চলে না। অবস্থা এখনও হাতের বাইরে চলে যায়নি। আপোশ-আলোচনায় মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সুজাতা তৈরি হয়েই আছে। তাকে নিরাশ করা যায় না। জ্ঞানব্রত নিজেই প্রস্তাব দিলেন, সুজাতা একাই চলে যাক। হোটেল তো বুক করাই আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। যদি কয়েকদিনের মধ্যে মিটে যায়, তাহলে জ্ঞানব্রত চলে যাবেন।

সুজাতা বলল, তাই যাই। দীপ্তি ফোন করেছিল, ওরাও ওই শনিবারে পুরী যাচ্ছে। ওই একই হোটেলে উঠবে।

দীপ্তির স্বামী মনীশ তালুকদার সুজাতাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে। জ্ঞানব্রত পরে জানতে পেরেছিলেন যে বিলেতে ওই মনীশ ছিল সুজাতার এক নম্বর প্রেমিক! অবশ্য তখন মনীশ ছিল মৌমাছি স্বভাবের, বিয়ের দিকে মন ছিল না। এই নিয়ে জ্ঞানব্রত কতবার মৃদু ঠাট্টা করেছেন সুজাতাকে।

বেশ তো, ভালোই হবে তা হলে। ওদের সঙ্গে তুমি বেড়াতে-টেড়াতে পারবে।

সুজাতা চলে যাবার দু-দিন বাদে এলা টেলিফোন করে জানাল, আপনি তো আলাপ করিয়ে দিলেন না। আমি কিন্তু নিজেই আলাপ করে নিয়েছি শশীকান্ত দাসের সঙ্গে।

জ্ঞানব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আলাপ হল?

রেডিয়ো স্টেশনে। চমৎকার মানুষ। এত সরল আর অনেক গানের স্টক।

হুঁ।

উনি কলকাতা শহরের কিছুই চেনেন না। কাল আমি ওকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা দেখিয়ে আনলুম।

ও!

আমি কিন্তু ওই শহরে ষোলো জন বোম্বেটে গানটার প্রথম কয়েক লাইন এর মধ্যে তুলে নিয়েছি।

আচ্ছা!

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন এলার সঙ্গে তিনি কোনোদিন দেখা করবেন না। কিন্তু টেলিফোনটা ছাড়বার পরই তাঁর মনে হল, কই এলা তো একবারও বলল না, আবার কবে দেখা হবে, কিংবা আমাদের বাড়িতে আসবেন!

একই সঙ্গে কাজের ব্যস্ততা আর অন্যমনস্কতা। কাজ তো করতেই হবে, অথচ প্রত্যেক দিন জ্ঞানব্রতর মনে পড়েছে এলার কথা। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে এলার বাড়িতে। মেয়েটা কি তাঁকে জাদু করেছে? এতগুলো বছরে জ্ঞানব্রতর কখনো পদস্খলন হয়নি, আর এখন ওই একটি মেয়ের জন্য! সুজাতার কাছে কি তিনি অপরাধ করেছেন!

পুরীতে দীপ্তির চোখে ধুলো দিয়ে মনীশ কি সুজাতার সঙ্গে গোপনে ঘনিষ্ঠতা করত চাইবে না? এ সুযোগ কি মনীশ ছাড়বে? দীপ্তির চেহারাটা হঠাৎ বুড়িয়ে গেছে, সেই তুলনায় সুজাতার শরীরের বাঁধুনি এখনও কত সুন্দর।

সুজাতা কি আগেই জানত যে মনীশরা এই সময় পুরীতে যাবে! সেইজন্যই ওর পুরীতে যাওয়ার এত উৎসাহ?

শশীকান্তর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি জ্ঞানব্রতর। একই বাড়িতে থাকলেও সুযোগ হয় না। দেখা হল রাস্তায়।

জ্ঞানব্রত কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সিতে এলা আর শশীকান্ত। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, শশীকান্তের চুল পরিপাটি ভাবে আঁচড়ানো, এলার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সেই হাসি আর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। জ্ঞানব্রত পরিষ্কার দেখতে পেলেন শশীকান্তের চোখে-মুখে এলার জাদু।

তাঁর বুকের মধ্যে ধুক ধুক শব্দ হতে লাগল। কঠিন হল চোয়াল। শশীকান্ত তাঁর আশ্রিত, সামান্য একটা গ্রাম্য লোক, তার এতটা বাড়াবাড়ি! কোথায় যাচ্ছে এখন? এই দিকেই এলার বাড়ি। শশীকান্তের উচিত ছিল না একবার জ্ঞানব্রতর কাছ থেকে অনুমতি নেবার?

ট্যাক্সিটা এখনও চোখের আড়ালে যায়নি, জ্ঞানব্রত তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, সোজা চলো।

যেমন ভাবেই হোক এলাকে রক্ষা করতে হবে। যার-তার সঙ্গে এমন ভাবে এলার মেলামেশা কোনোক্রমেই চলতে পারে না। এলার ফাঁকা ফ্ল্যাটে এইসময় শশীকান্তকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? গান শেখার জন্য-এই দুপুর বেলা? শশীকান্ত গ্রামের লোক। এলার মতন মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশার অভ্যেস নেই, মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, এবার কোন দিকে?

একমুহূর্তের জন্য যেন জ্ঞানব্রতর রক্ত চলাচল থেমে গেল। কোন দিকে কথাটা যেন একেবারে নাড়িয়ে দিল তাঁর চৈতন্য। এ তিনি কী করছেন? এলাকে শাসন করতে গেলে যদি আবার সে একটা মর্মভেদী কথা ছুঁড়ে দেয়? সেদিন এলা বলেছিল, সে স্বাধীন থাকতে চায়। যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে মিশবে...। এলা তো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কারখানায় ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর একটা গুরুতর বৈঠকে বসবার কথা এখন, আর তিনি ছুটছেন একটা মেয়ের পেছনে।

পুরীতে মনীশ যদি সুজাতাকে...। মনীশ ঠিক নিভৃত সুযোগ নেবে, ও এখনও রীতিমতন প্লেবয় ধরনের। বিভিন্ন পার্টিতে তিনি দেখেছেন মনীশ পরস্ত্রীদের পিঠে হাত রাখে। কিন্তু সুজাতা কি রাজি হবে? তিনি যদি গোপনে এলার বাড়িতে গিয়ে তাকে চুমু খেতে পারেন তাহলে সুজাতাই বা কেন...উজ্জয়িনী কাল রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরেছে। এত রাত পর্যন্ত ও কোথায় থাকে, কার সঙ্গে মেশে। জ্ঞানব্রতরই মতন অন্য কোনো লোক যদি উজ্জয়িনীর মতন একটা অল্প বয়সি মেয়ের মন জয় করতে চায়?

জ্ঞানব্রত একবার ভাবলেন। সবকিছু ছেড়েছুড়ে এলাকে নিয়ে নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করলে হয় না?

তারপরেই ভাবলেন, না, না। ওই ষোলো জন বোম্বেটেকে সবকিছু লুটেপুটে নিতে দেওয়া হবে না। আটকাতে হবে। মাথা ঠিক রাখতে হবে।

তিনি কড়া গলায় ড্রাইভারকে বললেন, কোন দিকে আবার? রোজ যেদিকে যাই সেদিকে যাব!

জীবনের পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে এসেছেন জ্ঞানব্রত। তাঁর সব রাস্তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর অন্য কোনো দিকে ফেরা যাবে না।